www.muslimdm.com

কুরআন সুন্নাহর আলোকে

মাযহাব ও তাকলীদ

মুফতী মনসূরুল হক

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

কুরআন সুন্নাহর আলোকে

মাযহাব ও তাকলীদ

সংকলনে

মুফতী মনসূরুল হক

প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সাত মসজিদ মাদরাসা

মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

www.muslimdm.com

প্রথম প্রকাশ : শাবান-১৪৩৫ হিজরী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল মানসূর

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ঢাকা ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

মাকতাবাতুল হেরা

৮২/১২এ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

০১৯৬১৪৬৭১৮১

মূল্য : ১৬০ টাকা

মাকতাবাতুল মানসূর

www.muslimdm.com

باسمه تعالى

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরাতুল ফাতিহায় বান্দাদেরকে তাঁর কাছে সরলপথের তাওফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সরলপথের ব্যাখ্যায় তিনি নির্দিষ্ট কোনো আমল বা কর্মপন্থার উল্লেখ করেননি। বরং তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের কর্মপন্থাকে সরল পথ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর অন্যত্র নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাদেরকে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সরলপথের ব্যাখ্যায় কর্মপন্থার পরিবর্তে ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ, আর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের তালিকায় নবীদের সাথে নেককার লোকদের অর্ন্তভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা মূলত: নবীর অবর্তমানে উম্মাহর জন্য কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের সঠিক পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। তারা কুরআন-সুন্নাহর বিধি-নিষেধের ওপর প্রাজ্ঞ-নেককার ব্যক্তির আমল ও কর্মপন্থা মোতাবেক আমল করবে; চাই বিধানটি স্পষ্ট হোক বা সূক্ষ্ম, দ্ব্যর্থহীন হোক বা দ্ব্যার্থবোধক, সংক্ষিপ্ত হোক বা বিস্তারিত। কারণ অনেক সময় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট শব্দাবলী থেকেও ভুল অর্থ অনুধাবনের আশংকা থাকে। উদাহরণত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

‘হে ইমানদারগণ! নিজেদের ফিকির কর। যখন তোমরা ঠিক পথে চলবে তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট তার কারণে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।’-সূরা মায়িদা:১৪০ এ আয়াতটির কথাই ধরুন। হযরত আবূ বকর রাযি. বলেন,

يأيها الناس ، إنكم تقرؤن هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال عن خالد : وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)

‘হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে ভুল স্থানে পেশ করছো যে, শুধু নিজের ফিকির করলেই যথেষ্ট হবে, অপরাপর মানুষের হেদায়াতের ফিকির করতে হবে না,) অথচ আমি নবীজী صلى الله عليه وسلم কে বলতে শুনেছি, যখন মানুষ কাউকে জুলুম করতে দেখবে কিন্তু তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না তখন অতিসত্বর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে আযাবে লিপ্ত করবেন।’ (সুনানে আবূ দাউদ হা.৪৩৩৮)

তো দেখা যাচ্ছে, দীন পালনে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য নেক ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের থেকে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক মর্ম জেনে নেয়া এবং এ

দু‘টোর উপর আমলের ক্ষেত্রে তাদের আমলের অনুসরণ করা আল্লাহ তা‘আলারই নির্দেশ। এখন এটাকে কেউ ইত্তিবা আর অনুসরণ বলুক কিংবা তাকলীদ আর মাযহাব অনুসরণই বলুক। কিন্তু এই সহজ ও সাধারণ বিষয়টিকে বর্তমানে ভুলভাবে উপস্থাপন করে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। দীনের সংক্ষিপ্ত, সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর শিষ্যদের মতামত অনুসরণকে শিরক আর অনুসারীকে মুশরিক বলা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, বহু সাহাবায়ে কেরামের স্নেহধন্য কূফা নগরীর ইলমী মসনদের মহান ইমাম ও তাঁর শিষ্যগণ কি কারো অনুসরণযোগ্য নয়? ছোট যদি দক্ষ ও প্রাজ্ঞ বড়র ব্যাখ্যা অনুযায়ী দীনের অনুসরণ করে এটাকে শিরক বলা যায় কি? পাক-ভারত-বাংলায় তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো সময় রফয়ে ইয়াদাইন করে না এমন একজন সাধারণ মুসলমানকে তার ধর্ম, কিতাব ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখুন, উত্তরে সে ইসলাম, কুরআন ও মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم কে বাদ দিয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মাযহাবের নাম বলে কিনা ? যদি না বলে, তাহলে কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলা হয় যে, এরা কুরআন-হাদীস না মেনে আবূ হানীফাকে অনুসরণ করে ? হাঁ, তারা অবশ্যই ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার শিষ্যদের অনুসরণ করে, তবে তা তাঁর ও তাঁর শাগরেদদের কুরআন-সুন্নাহয় গভীর পাণ্ডিত্য ও তাকওয়া-তাহারাতের ভিত্তিতে তাদের সংকলিত ফিকহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; যা তারা অর্জন করেছিলেন পর্যায়ক্রমে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান, ইবরাহীম নাখয়ী, আলকামা ও আসওয়াদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর মাধ্যমে নবীজী صلى الله عليه وسلم এর নিকট থেকে। তাহলে দক্ষ ও যোগ্য মুজতাহিদের কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে আহরিত ফিকহ অনুসরণ করা আর নির্ভেজাল কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইমাম বুখারীকে রহ. দেখুন, বুখারী শরীফে তিনি প্রায় প্রতিটি হাদীসের শুরুতে তরজমাতুল বাব নামে তার আহরিত ফিকহ সন্নিবেশিত করেছেন। এ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই। তো ইমাম বুখারী রহ. (মৃত:২৫৬ হি.) এর ফিকহ যদি অনুসরণীয় হয়, তাহলে তার উস্তাদের উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা রহ. (জন্ম: ৮০ হি. মৃত:১৫০ হি.) এর ফিকহ কেন অনুসরণীয় হবে না? মাসআলা উদ্ভাবনে কিয়াস করেছেন বলে কি তার ফিকহ পরিত্যাজ্য হবে? কুরআন সুন্নাহয় কোনো সমস্যার সমাধান পাওয়া না গেলে কিয়াস করা তো শরী‘আতেরই নির্দেশ। হযরত মুআয রাযি. এর اجتهد برأى (কুরআন-সুন্নাহয় না পেলে আমি আমার রায় দ্বারা সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা করব) কথাটি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তা সত্ত্বেও সর্তকতা স্বরূপ ইমাম আযম রহ. কুরআন-সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও তাদের কর্মপন্থায় সমাধান খুঁজেছেন। এতেও পাওয়া না গেলে তখন তিনি কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন। তা ছাড়া এ আমল তো তার একারও নয়; কিয়াস তো খোদ নবীজী صلى الله عليه وسلم , সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনেরও

আমল ছিল। প্রচার করা হয়, হানাফী মাযহাবে দুর্বল বর্ণনা সূত্রের হাদীসের উপর আমল করা হয়। দেখুন না, যঈফ হাদীস যদি একেবারেই পরিত্যাজ্য হবে তাহলে ইমাম বুখারী রহ. কেন যঈফ হাদীসের ভিত্তিতে তার সহীহ হাদীসের কিতাব 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু করেছেন? শুধু ইমাম বুখারী রহ. এর জন্য যঈফ হাদীসের উপর আমল বৈধ, অন্য কারো জন্য নয় এর কী ভিত্তি আছে? হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একেক মুহাদ্দিসের একেক মানদণ্ড থাকে। ফলে একই হাদীস কারো কাছে সহীহ, কারো কাছে যঈফ হতে পারে। সে হিসেবে ইমাম আযম রহ. এর কি হাদীস যাচাইয়ের ভিন্ন কোনো মানদণ্ড থাকতে পারে না? এবং তার যাচাই অনুযায়ী কোনো হাদীস সহীহ হলেও তার পরবর্তী কোনো রাবীর দুর্বলতার কারণে তা কি যঈফ হতে পারে না? তো পরবর্তী রাবীর দুর্বলতার কারণে ইমাম আযমের যাচাইকৃত সহীহ হাদীসটি দুর্বল হয়ে পড়বে কি? কস্মিন কালেও নয়।

একটু ভাবুন! আজ খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রলোভনে ও প্রোপাগাণ্ডায় সকালের মুমিন বিকেলে 'ঈসায়ী জামাত' এর সদস্য হয়ে যাচ্ছে; ঈমান-আকীদা বিষয়ক অজ্ঞতার ফলে দলকে দল মুসলিম কাদিয়ানী হয়ে যাচ্ছে; সিংহভাগ উম্মাহ ফরয-ওয়াজিব সম্পর্কে বে-খবর; পতঙ্গের ন্যায় তারা বদদীনী ও ধর্মহীনতার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় মুস্তাহাব-মাকরূহ আর উত্তম-অনুত্তম নিয়ে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট করার চেয়ে উম্মাহকে এসব হায়েনার কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া সময়ের দাবি নয় কি? তাহলে, দু'টি আমলই সুন্নাহ সমর্থিত হওয়ার পর হাদীস মানার নামে একটি সুন্নাহর উপর পূর্ব থেকে আমল চালু থাকা অবস্থায় কেন বিরপীতধর্মী অপর সুন্নাহটির প্রতি উম্মাহকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে এবং চালু সুন্নাহটিকে বিদআত বলা হচ্ছে? সহজ-সরল উম্মাহর বিগড়ে যাওয়া আর ইয়াহুদ-নাসারাদের খুশি করা ছাড়া এতে কার কি লাভ হচ্ছে? ওরা তো চায় মুসলিম উম্মাহ এভাবেই সবসময় নিজেদের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে কাটিয়ে দিক আর আমরা দেখে দেখে বগল বাজাই, ফায়দা লুটি। উম্মাহ সতর্ক হোক, সত্য উপলব্ধি করুক, নিজেদের কর্মকাণ্ড পুনর্বিবেচনা করুক, ইয়াহুদ-নাসারাদের 'বিভেদ ঘটিয়ে শাসন কর' নীতি অনুধাবন করুক- এ মানসেই মূলত কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে। বক্ষমান পুস্তকে দেখানো হয়েছে, হানাফী মাযহাব ভূঁইফোড় কোনো বস্তু নয়; শরী'আতের দলীল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতেই এটি সংকলিত হয়েছে। কুরআন, হাদীস, ইজমার মতো কিয়াসও শরী'আতের দলীল। শুধু ইমাম আবূ হানীফাই রহ. কিয়াস করেছেন তা নয়, এটা স্বয়ং নবীজী صلى الله عليه وسلم এবং সাহাবায়ে কেরামেরও আমল। অনুরূপভাবে তাকলীদ ও মাযহাব মানা অর্থাৎ শরী'আতের সংক্ষিপ্ত, সূক্ষ্ম ও দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির মতামত অনুযায়ী আমল করাও নতুন কিছু নয়; নবীযুগ থেকেই তা চলে আসছে। অনুরূপ বহু মাযহাব ও মতামত সত্ত্বেও কেন তা 'চার' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলো; মন মতো একেক সময় একেক মাযহাব অনুসরণ

করা কেন বৈধ নয়; মুহাদ্দিসিনে কেরামের কেউ কেউ নিজে নিজে হাদীসগ্রন্থের সংকলক হয়েও কেন আইম্মায়ে মাযহাবের ফিকহ্ অনুসরণ করতেন। আর তাছাড়া আইম্মায়ে মাযহাবের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর শ্রেষ্ঠত্য, ফিকহ্ ও হাদীস শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য, উম্মতের উপর তার সীমাহীন অনুগ্রহ ও তাঁর ব্যাপারে সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম এমনকি অন্যান্য মাযহাবের ইমামদের স্বীকারোক্তি ও ভূয়সী প্রশংসা, অনস্বীকার্য ।

কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ এ কাজে কয়েকজন তালিবুল ইলম আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উভয়জাহানে কামিয়াব করুন এবং সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। পরিশেষে বিষয়টি যেহেতু শাস্ত্রীয় আলোচনা, এজন্য চেষ্টা সত্ত্বেও অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলে তা সাদরে ও কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহিত হবে।

বিনীত
মুফতী মনসূরুল হক

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা
শুরুর কথা	৫
আল্লাহর আইন/ইসলামী শরী'আতের উৎস	৬
১. কুরআনুল কারীম	৭
২. সুন্নাহ	৮
৩. ইজমা	৯
৪. কিয়াস	১৩
ইজতিহাদ ও তাকলীদ	১৭
ইজতিহাদ সমর্থন	২৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কিয়াস	২৭
সাহাবা কর্তৃক কিয়াস	২৯
রাসূলুল্লাহ যুগে তাকলীদ	৩৩
সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদের অনুসরণ	৩৫
সাহাবাযুগে কিয়াস ও ইজতিহাদের নমুনা	৩৯
সাহাবাযুগে তাকলীদ	৪৪
তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে কিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ	৪৬
তাকলীদ সম্পর্কে তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের উক্তি	৫৩
চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মত ইমাম মেনে দ্বীনের উপর আমল	৬৫
যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরীনে কেরাম সকলেই মাযহাবপন্থী	৬৯
বড় বড় হাদীস বিশারদগণ নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ	৭২
শাজারায়ে মুবারাকাহ	৭৬
নির্দিষ্ট মাযহাব মানার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা ও ঐক্যমত	৭৭
ইজমা অস্বীকার ও অমান্যকারীর অশুভ পরিণতি	৮৩
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্ব	৮৬
ফিকহের আভিধানিক অর্থ	৯২
ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবদান	৯৫
ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহ. যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও আলেম ছিলেন	৯৯
ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন	১০৩
হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য	১০৫
সকল হাদীসের উপর আমল করতে বলা হয়নি	১০৯
সুন্নাহ ও ফিকহ এক ও অভিন্ন জিনিস	১১৭
নির্দিষ্ট মাযহাব মানার শরয়ী বিধান	১২১
তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাযহাব মানার হাকীকত	১২৭
আকাবিরদের কয়েকটি ফাতাওয়া	১২৮
মাযহাব না মানলে হাদীসের উপরও পুরোপুরি আমল করা সম্ভব নয়	১২৯
জামাআতে নামায আদায়কারী মুসল্লীদের পরস্পরের পা	১৩২
তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযী	১৩৭
তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত	১৩৯
নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান	১৪১

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার পদ্ধতি	১৪২
মাযহাবের বিভিন্নতা ও তাকলীদের হাকীকত	১৪৬
মাযহাব একাধিক হল কেন?	১৪৯
হানাফী মাযহাবের উৎস	১৫১
তাকলীদ না করার পক্ষে যাদের কথা দলীল	১৫২
হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ	১৫৬
অভিযোগের অসারতা প্রমাণ	১৫৯
১ম ধারা:	১৬০
২য় ধারা:	১৬২
৩য় ধারাঃ	১৬৫
চতুর্থ ধারাঃ	১৬৮
হানাফী মাযহাবের উপর উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর	১৬৯
দালীলিক প্রমাণপঞ্জির আয়নায় আহলে হাদীস মতবাদ	১৭০

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

শুরুর কথা

‘রব’ আল্লাহ তা‘আলার গুণবাচক নাম। আদি-অন্ত সর্বগুণের ধারক, সত্তা হিসেবে অধীনস্তের উপযোগিতা বিবেচনা করতঃ যিনি তাকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌঁছান তিনিই রব। উল্লেখ-অযোগ্য বস্তু থেকে সৃষ্ট বনী আদমকে শক্ত-সামর্থ্যপূর্ণ মানবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তিনি যেমন রব, বাধা-বন্ধনহীন দায়ভারমুক্ত মানুষকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করার ক্ষেত্রেও তিনি রব। সে মতে মানবজাতির ক্রমবিকাশ অনুযায়ী ‘রব্বুন নাস’, আল্লাহ তা‘আলা যুগে যুগে আইন স্বরূপ কিতাব ও রিজাল প্রেরণ করেছেন। কিতাবুল্লাহ বর্ণিত আইন বিশ্লেষণ করে এর ব্যবহারিক দিকটি মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন রিজালুল্লাহ। এভাবেই সায়্যিদুনা শীস ‘আলাইহিস সালাম থেকে সর্বযুগে শরী‘আতে ইলাহী পালিত হয়ে আসছে। এই ধারাবিহকতায় চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ শরী‘আত হিসেবে নবীজী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে কুরআনুল আযীম। ইরশাদ হচ্ছেঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সুতরাং) এ দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পালন করো। (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, সূরা মায়িদা-৩)

কুরআনুল আযীমে আল্লাহ তা‘আলা কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির দ্বীনি সকল সমস্যার সমাধান বাতলে দিয়েছেন। কোনোটি স্পষ্টভাবে সবিস্তারে, কোনোটি সংক্ষেপে মূলনীতি আকারে। এদিকে মানুষের স্বভাব চরিত্র, রুচি-বৈশিষ্ট্য অভিন্ন নয়। স্থান কাল পাত্র ভেদে তার সমস্যাবলিও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করতে হবে সরল পথ সীরাতে মুস্তাকীম। এজন্য উদ্ভূত সমস্যা নিরসণকল্পে তাকে কুরআন ও তার ব্যাখ্যা সুন্নাহ থেকে জেনে নিতে হবে আল্লাহর আইন-ইসলামী শরী‘আতের উৎস কী কী? যেন এর আলোকে সে খুঁজে নিতে পারে কাঙ্ক্ষিত মানযিল।

আল্লাহর আইন/ইসলামী শরী‘আতের উৎসঃ

ইসলামী শরী‘আতের উৎস তথা দলিল চারটিঃ

১. কুরআনুল কারীম

২. সুন্নাহ

৩. ইজমা

৪. কিয়াস।

সংক্ষেপে এগুলোর পরিচয় ও প্রমাণ তুলে ধরা হলো।

১. কুরআনুল কারীমঃ

কুরআন সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখতে হবে।

ক. কুরআন আল্লাহ তা‘আলার কালাম। মানব রচিত গ্রন্থ নয়। কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ, নিদেনপক্ষে এর ছোট্টতম সূরার সমমানের একটি সূরা প্রণয়নে মানুষের অক্ষমতাই এর প্রমাণ। চৌদ্দশ বছর পেরিয়ে গেছে; কুরআনের সাহিত্য-সুষমা, শিল্পগুণ, অর্থ-মর্ম ও ভাব-ব্যঞ্জনার আদলে একটি আয়াতও আজ পর্যন্ত কেউ গড়তে পারেনি। এ বিষয়টিই কুরআনুল কারীম অসীম শক্তিধর সত্তা আল্লাহ তা‘আলার কালাম হওয়ার প্রমাণ।

খ. কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ইসলামের প্রধান দলীল। বিষয়টি চৌদ্দশ বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সরাসরি শ্রবণ ও আত্মস্থ করার দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। হঠকারিতা বশতঃ দুপুরের তেজোদীপ্ত সূর্যকেও অস্বীকার করা যেতে পারে কিন্তু এ বাস্তবতাকে শত্রু-মিত্র কেউ অস্বীকার করতে পারে না। (বিস্তারিত জানতে আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ্ পৃষ্ঠা ২৬, তাকবীমুল আদিল্লাহ পৃষ্ঠা ২০)

২. সুন্নাহঃ

ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ। উম্মতের উদ্দেশ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। যারা কুরআন মেনে নিয়েছে তারা সুন্নাহ মানতেও বাধ্য। কারণ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্ম অনুসরণের নির্দেশ এসেছে। সাহাবায়ে কেরামসহ গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত যে, সুন্নাহ ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ের দলীল। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা সুন্নাহর অনুসরণ উম্মতের অবশ্য কর্তব্য এ-সম্পর্কিত কুরআনের কয়েকটি আয়াতঃ

এক.

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ

‘তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের’। (সূরা তাগাবুন, আয়াত-১২)

দুই.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো আর যা কিছু থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।’ (সূরা হাশর, আয়াত ৭)

তিন.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

'হে নবী! মানুষকে বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো।' (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৩১) (বিস্তারিত জানতে হুজ্জিয়াতে হাদীস: পৃষ্ঠা ১৫-২০)

৩. ইজমাঃ

ইসলামী শরী'আতের তৃতীয় পর্যায়ের দলীল ইজমা। ইজমা হলো, উম্মতে মুহাম্মাদীর সত্যনিষ্ঠ মুজতাহিদগণের একই যুগে কোনো কথা বা কাজের ওপর ঐক্যমত পোষণ করা। (নূরুল আনওয়ার পৃ:-২১৯) ইজমা তার যাবতীয় শর্তসহ সংঘটিত হয়ে গেলে তার অনুসরণ ওয়াজিব; বিরোধিতা নাজায়িয ও গোমরাহী। (আল ওয়াজিয-পৃষ্ঠা:৫২)

ইজমা শরী'আতের দলীল হওয়ার প্রমাণঃ

কুরআনের ভাষ্যঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।' (সূরা নিসা, আয়াত ১১৫)

আয়াতে কারীমায় 'মুমিনদের পথ' অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এটাই ইজমা। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ইজমা শরী'আতের দলীল, এর বিরোধিতা করা হারাম। বিষয়টি অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর ইমাম শাফেয়ী রহ. এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৪৬০)

হাদীসের আলোকে ইজমাঃ

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ইজমা শরী'আতের দলিল এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসমূহ অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। উদাহরণতঃ

لاتجتمع امتي على ضلالة

আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একমত হবে না। (জামে তিরমিযী হাদীস নং ২১৬৭)

এ-জাতীয় বহু হাদীস সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে ইজমা শরী'আতের দলীল।

সাহাবাযুগে ইজমাঃ

সকল সাহাবা রা. ইজমাকে শরী'আতের দলীল মনে করতেন। সাহাবাযুগে ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলোঃ

ক. নাতি-নাতনির মীরাস থেকে দাদির এক ষষ্ঠাংশ পাওয়া।

খ. যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত কোনো অবস্থায়ই তরক না করা।

গ. এক বোনের ইদ্দত চলাকালীন তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে অপর বোনের বিবাহ অবৈধ হওয়া।

ঘ. বিশুদ্ধ নির্জনবাসের দ্বারা মহর আবশ্যক হওয়া। ইত্যাদি। (নূরুল আনওয়ার পৃষ্ঠা ২২২)

এ-জাতীয় আরো অনেক মাসআলা সাহাবায়ে কেরাম রা. এর যুগে ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। (বিস্তারিত: আলমাহসুল ফী ইলমিল উসূল ২/৩৪, কাওয়াতিউল আদিল্লাহ ফিল উসূল পৃ. ৪৬১)

৪. কিয়াসঃ

শরী‘আতের চতুর্থ দলীল কিয়াস। কিয়াসের শাব্দিক অর্থ অনুমান করা, পরিমাপ করা। পরিভাষায়ঃ যে বিষয়ের বিধান কুরআন হাদীস বা ইজমাতে সুস্পষ্টভাবে নেই সেটাকে কুরআন, হাদীস বা ইজমায় বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধান সংবলিত অনুরূপ কোনো বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তার বিধান বের করা; উভয় বিষয়ে বিধানের কারণ এক হওয়ার কারণে। (আল ওয়াজীয পৃ: ৫৬)

কিয়াস শরী‘আতের দলীল হওয়ার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

কুরআনের আলোকে কিয়াসঃ

কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা কিয়াস সাব্যস্ত হয়। সূরায়ে হাশরের দুই নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী গোত্র বনী নযীরের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা করার পর বলেছেন, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

‘হে চক্ষুষ্মানেরা! নিজেদের অবস্থা এদের সঙ্গে পরিমাপ করো।’ (এবং শিক্ষা গ্রহণ করো।)

আয়াতে কারীমার তাফসীরে আল্লামা মাহমুদ আলূসী রহ. বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম এই আয়াত দ্বারা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ তা‘আলা এখানে ই‘তিবার এর নির্দেশ দিয়েছেন। ই‘তিবার মানে অতিক্রম করা, এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর দিকে যাওয়া। কিয়াসের মধ্যেও হুবহু এই ব্যাপারটি পাওয়া যায়। কারণ কিয়াস অর্থই হল মূলের বিধানকে শাখার ওপর আরোপ করা। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ১৫/৫৯)

এ ছাড়া সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত এবং সূরা ইয়াসীনের ৭৯নং আয়াত দ্বারাও কিয়াস সাব্যস্ত হয়। (বিস্তারিতঃ আলওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ পৃঃ ৫৯)

সুন্নাহর আলোকে কিয়াসঃ

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিয়াস করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন।

একবার রমাজান মাসে হযরত উমর রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করা কেমন? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রোযা অবস্থায় তুমি যদি কুলি করো এতে কোনো সমস্যা হয় কি? হযরত উমর রা. বললেন, না, তা তো হয় না। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে পেরেশান হচ্ছো কেন?

দেখা যাচ্ছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের ভূমিকা চুম্বনকে পান করার ভূমিকা কুলির ওপর কিয়াস করেছেন এবং কুলির দ্বারা রোযা ভঙ্গ না হওয়ার বিধানকে বীর্যপাতহীন চুম্বনের ওপর প্রয়োগ করেছেন। (আল মুহাররার ফী উসূলিল ফিকহ ২/১০১ ও আলওয়াজীয পৃ: ৬০)

ইজমার আলোকে কিয়াসঃ

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সাহাবায়ে কেরাম রা.ও অনেক ক্ষেত্রে কিয়াস করে শরয়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু কোনো একজন সাহাবীর পক্ষ থেকেও এর বিরোধিতা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় কিয়াস শরী‘আতের দলীল হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাহাবাযুগের কিয়াসের দৃষ্টান্তঃ

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর খলীফা নির্বাচন প্রসঙ্গে অনেক সাহাবীই খেলাফতকে ইমামতে সালাতের ওপর কিয়াস করে হযরত আবূ বকর রা. কে মনোনীত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেনঃ

رضيه رسول الله لديننا أفلانرضي لدنيانا.

‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দ্বীনী ব্যাপারে তাঁকে পছন্দ করেছেন, আমরা কি আমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে তাঁকে পছন্দ করব না।

উল্লেখ্য, এই কিয়াস পেশ করা হয়েছিল গণ্যমান্য সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে। কিন্তু কেউ তা দলীল নয় বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। অতএব সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতের ভিত্তিতেও কিয়াস শরী‘আতের দলীল সাব্যস্ত হলো। (বিস্তারিত জানতে আলওয়াজীয পৃঃ ৬০, তাকবীমুল আদিল্লাহ পৃঃ ২৭৮)

সুতরাং অধুনা যেসব মুসলমান ইজমা ও কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল মানতে চান না, তাদের ভুল সিদ্ধান্ত পরিহার করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদার দিকে ফিরে আসা ঈমানী দায়িত্ব। যাতে আহলে হকের বিরোধিতার কারণে আখেরাতে আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিয়াস ইজতিহাদ ও তাকলীদ

ইসলামী শরী‘আতের চার উৎস-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা কিয়াস সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই। কুরআন ও সুন্নাহর শরয়ী দলীল হওয়ার বিষয়টি একমাত্র কাফের মুলহিদ ছাড়া

কেউ অস্বীকার করে না। ইজমা দলীল হওয়ার ব্যাপারেও উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তর অংশের মতৈক্য রয়েছে। কিয়াসের ব্যাপারটিও তাই। কিন্তু মাযহাবের নিরাপদ গণ্ডিতে শরী'আত অনুসরণকারীদের হেনস্থা করতে সুযোগসন্ধানীরা কিয়াসকে মোক্ষম হাতিয়ার মনে করে। তারা বলতে চায়, মাযহাবসমূহ বিশেষত হানাফী মাযহাব কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক নয়; বরং মাযহাবের উৎস হলো কিয়াস। তাদের এ বক্তব্য নিছক মূর্খতাপ্রসূত কিংবা পরিষ্কার হঠকারিতা। শরী'আতের আইন সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনিও জানেন, দলীল চতুষ্টয়ের মধ্যে কিয়াসের ধারাক্রম চতুর্থ নম্বরে। অর্থাৎ উদ্ভূত কোনো সমস্যার সমাধান ধারাক্রম অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় পাওয়া না গেলে তখনই কেবল কিয়াসের আশ্রয় নেয়া যায়। তাও এ শর্তে যে, কিয়াসটি প্রথমোক্ত তিন দীললের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হতে হবে। তবে শরী'আতের জ্ঞানে বুৎপত্তি নেই এমন ব্যক্তির নিকট কিয়াসলব্ধ সিদ্ধান্তকে ক্ষেত্রবিশেষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা পরিপন্থী মনে হতে পারে; কিন্তু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিয়ে খতিয়ে দেখলে তার কাছেও সেটা পরিষ্কার কুরআন, সুন্নাহ প্রতিভাত হবে। কিয়াস যে শরী'আতের অন্যতম দলীল তা অনস্বীকার্য। এতদসংক্রান্ত সন্দেহ-সংশয়ের নিরসনে আমরা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সংঘটিত কিয়াস ও ইজতিহাদ নিয়ে আলোচনা করব।

জানা দরকার, কিয়াস মূলত ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত; ভিন্ন কিছু নয়। কারণ রায় বা ইজতিহাদ বলা হয় নব উদ্ভাবিত বিষয়ের বিধান শরী'আতের মূল ভাষ্য কুরআন, সুন্নাহ থেকে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের পদ্ধতিতে উদ্ঘাটন করা। তাঁদের পদ্ধতি হলো, বিধান-অজ্ঞাত বিষয়কে কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত বিধানজ্ঞাত অনুরূপ বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে জ্ঞাত বিধানটিকে অজ্ঞাত বিষয়ের ওপর আরোপ করা। আর এটাই কিয়াস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লমের ইজতিহাদ

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ওহীর আগমন সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বিষয়ে ইজতিহাদ করে বিধান জারি করেছেন। হাদীস, সীরাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত-১

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। হুবাব ইবনুল মুনযির রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার এ অবস্থান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে, না আপনার ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার নিজস্ব মতামত। হুবাব ইবনুল মুনযির রা. বললেন, আমার মতে আপনি

শত্রুপক্ষের আগমনের পূর্বে বদরের পানিবিশিষ্ট অংশে ছাউনি ফেলুন। যুদ্ধকৌশল উপযোগী এ মত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একটি উত্তম পরামর্শ দিয়েছো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে অনুযায়ী ছাউনি ফেললেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/২৮০, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩২, উসূলুল জাসসাস ২/২০৮-২০৯)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজ রায়ের ভিত্তিতে একটি স্থান নির্বাচন করলেন, তারপর হুবাব রা. এর মতামত শুনে সেটাকে স্বীয় দ্বিতীয় ইজতিহাদ দ্বারা প্রাধান্য দিলেন।

দৃষ্টান্ত-২

মক্কাবাসীরা বদর যুদ্ধের মুক্তিপণ পাঠাল। রাসূল তনয়া হযরত যায়নাব রা. এর স্বামী আবূল আসের (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) মুক্তিপণ হিসেবে একটি হার পাঠালেন। হারটি যায়নাবের বিবাহের সময় হযরত খাদিজা রা. উপহার দিয়েছিলেন। খাদিজা রা. এর স্মৃতিবহ হারটি নবীজীকে পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেনঃ

ان رايتم ان تطلقوالها اسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا.

তোমরা ভালো মনে করলে যায়নাবের খাতিরে তার বন্দিকে ছেড়ে দিতে পারো এবং হারটি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো। নবীঅন্তঃপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন, কেন নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তারা আবূল আসকে ছেড়ে দিলেন এবং হারটি যায়নাব রা. এর নিকট ফিরিয়ে দিলেন।(আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা ৩/৩২৭)

এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিদয়া নিয়ে বন্দিমুক্তির ব্যাপারটি নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। কারণ মুক্তিপণ নেয়া আল্লাহর বিধান হলে সেখানে কাউকে ছাড় দেয়ার প্রশ্নই আসত না। অপরদিকে যায়নাবের ব্যাপারে আলাদা বিধান হলে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শেরও প্রয়োজন হতো না।

দৃষ্টান্ত-৩

খন্দক যুদ্ধের সময় আরবের জাতিপুঞ্জ নিজেদের শক্তি নিয়ে মদীনা অবরোধ করে বসল। অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং দুঃখ-কষ্ট অসহনীয় হয়ে ওঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবতে লাগলেন, না জানি আনসারগণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েন। তাই তিনি মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে গাতফানীদের নিকট অবরোধ তুলে নেয়ার শর্তে সন্ধি প্রস্তাব করলেন। উভয় পক্ষ সম্মত হলো এবং সন্ধিপত্র লেখা হলো। কেবল স্বাক্ষরিত হওয়াই বাকি ছিল। অবশিষ্ট কাজটুকু করার পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সরদার সাদ ইবনে মুআয ও সাদ ইবনে উবাদা রা. কে ডেকে এ

ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। তারা উভয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি আমাদের কল্যাণার্থে আপনার নিজের প্রস্তাব, না আল্লাহ আপনাকে এ জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যা আমাদেরকে করতে হবে? অন্য বর্ণনামতে তাদের প্রশ্ন ছিল, এটা আপনার মতামত, নাকি ওহী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার নিজের উদ্যোগ। কারণ, আমি দেখছি গোটা আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে এবং সবদিক দিয়ে তোমাদের ওপর দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ আরোপ করেছে। তাই যতটা পারা যায় আমি তাদের শক্তি চূর্ণ করতে চাচ্ছি।

হযরত সাআদ ইবনে মুআয রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইতিপূর্বে আমরা এবং এসব লোক শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। তখন আমরা আল্লাহকে চিনতাম না এবং আল্লাহর ইবাদত করতাম না। সে সময় তারা মেহমানদারী অথবা বিক্রয়ের সূত্রে ছাড়া আমাদের একটা খোরমাও খেতে পারেনি। আর আজ আল্লাহ তা‘আলা যখন আমাদেরকে ইসলামের গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করেছেন, সত্যের পথে চালিত করেছেন, তখন তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ দিতে হবে? আল্লাহর কসম! আমাদের এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম! তরবারির আঘাত ছাড়া তাদেরকে আমরা আর কিছুই দিব না। এভাবেই আল্লাহ তাদের ও আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, আনসারগণ ভগ্নোৎসাহ হওয়ার পাত্র নন। বললেন, বেশ তাহলে এ ব্যাপারে তোমার মতই মেনে নিলাম। এর পর হযরত সাআদ ইবনে মুআয রা. চুক্তিপত্রখানা হাতে নিয়ে সমস্ত লেখা মুছে ফেললেন এবং বললেন, ওরা যা পারে করুক। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/২৪৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১১৩)

এই ঘটনায়ও হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজস্ব ইজতিহাদ পরিলক্ষিত হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ইজতিহাদ তরক করে দ্বিতীয় ইজতিহাদটি গ্রহণ করলেন।

দৃষ্টান্ত-৪

একবার হযরত আলী রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে কোথাও কোনো দায়িত্ব দিয়ে পাঠালে সে ক্ষেত্রে আমি কি সীলমোহরকৃত মুদ্রার ন্যায় হবো, নাকি প্রত্যক্ষদর্শী হবো যে, সব কিছু নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করব? অর্থাৎ আপনি যেভাবে বলে দিয়েছেন হুবহু সেভাবেই করব, নাকি অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি বরং প্রত্যক্ষদর্শির ন্যায় হবে যে এমন অনেক বিষয় লক্ষ্য করে, যা অনুপস্থিত ব্যক্তি করে না। (মুসনাদে আহমাদ হা. ৬২৮)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে পরিস্থিতি দেখে বিবেচনা করে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। এরই নাম ইজতিহাদ।

দৃষ্টান্ত-৫

বারীরা নাম্নী এক মহিলা হযরত আয়েশা রা. এর বাঁদী ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা. কে বারীরাকে আযাদ করে দিতে বললেন। বারীরার স্বামী মুগীছও ছিল এক ব্যক্তির গোলাম। আযাদ করার পর বিধিমতে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে তার পূর্বস্বামী মুগীছ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার দিলেন। মুগীছ ছিলেন কালো বর্ণের অসুন্দর পুরুষ। কাজেই বারীরা মুগীছকে স্বামীরূপে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিল। এদিকে মুগীছ ছিলেন বারীরার প্রতি সীমাহীন আসক্ত। তিনি বারীরার পেছন পেছন মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে কেঁদে বুক ভাসাতেন। কিন্তু বারীরা ছিল নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। একপর্যায়ে ব্যাপারটি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও ভাবিয়ে তুলল। তিনি বারীরাকে বললেন, তুমি যদি আবার মুগীছকে গ্রহণ করতে! সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? নবীজী বললেন, না, আমি তো সুপারিশ করছি মাত্র। বারীরা বলল, তাহলে তার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫২৮৩)

এই ঘটনায়ও নবীজীর ইজতিহাদ লক্ষ্য করা গেল।

এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে চাষাবাদ, চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবহার-সংক্রান্ত অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে তিনি ইজতিহাদ ও রায় দ্বারা ফায়সালা করেছেন। (উসূলুল জাসসাস ২/২২৪)

কিয়াস অস্বীকারকারী বন্ধুরা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা পুনর্বিবেচনা করার যথেষ্ট উপকরণ পেয়ে যাবেন আশা করি। আল্লাহ তা‘আলাই তাওফীকদাতা। অবশ্য এটুকুতে ক্ষান্ত না করে কিয়াসের স্বপক্ষে আমরা আরো কিছু প্রমাণ পেশ করছি।

উলামা সাহাবাদের প্রতি ইজতিহাদের নির্দেশঃ

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, ‘আর তাদের নিকট যখন কোনো বিষয়ের সংবাদ পৌঁছে, নিরাপত্তার হোক বা ভয়ের হোক, তারা (যাচাই না করে তৎক্ষণাৎ) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি এটাকে রাসূলের ওপর এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের ওপর সমর্পন করত তবে তাদের মধ্যে যারা সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত।’ (সূরা নিসা ৮৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ‘এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বের হয় যাতে অবশিষ্ট লোক দ্বীনি জ্ঞান

অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কওম (অর্থাৎ জিহাদে যোগদানকারীদেরকে নাফরমানী) হতে ভয় প্রদর্শন করে, যখন জিহাদকারীরা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে যেন তারা পরহেয করে চলে।' (সূরা তাওবা ১২২)

এ ছাড়া আরও বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইজতিহাদ, ইস্তিম্বাত অর্থাৎ দ্বীনের পরিপক্ব গভীর জ্ঞান অর্জন করে মাসাইল বের করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসের বাণীঃ

হযরত আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিচারক যখন ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয় তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব, আর যদি তার ইজতিহাদে ভুল হয় তার জন্য রয়েছে ইজতিহাদের ছওয়াব। (বুখারী শরীফ ৭৩৫৯, মুসলিম শরীফ ২৬৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. কে ইয়ামান প্রেরণের প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো বিচার এলে তুমি কিভাবে তার ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়সালা করব। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কিতাবুল্লায় না পাও? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা। বললেন, যদি কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলের সুন্নাহয়ও না পাও? তিনি বললেন, আমার রায় দ্বারা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেব এবং এতে কোনোরূপ ত্রূটি করব না। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুশিতে) তার সিনায় চাপড় মেরে বললেন, আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা যিনি রাসুলুল্লাহর দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন, যা রাসুলুল্লাহকে সন্তুষ্ট করে দেয়। (সুনানে আবূ দাউদ ৩৫৯২)

হযরত মু'আবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাঁকে তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনের গভীর বুৎপত্তি দান করেন। (বুখারী শরীফ ৭১, মুসলিম শরীফ ১০৩৭)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইলমের অনেক বাহক আছে যে তার চেয়ে বেশি বোঝে এমন কারও নিকট ইলম পৌঁছে দেয়। (সুনানে আবূ দাউদ ৩৬৬০, জামে তিরমিযী ২৬৫৬)

এই হাদীস থেকে জানা গেল বাহক এখানে ইলমের শুধু মূল কথাটি কিংবা সামান্য ব্যাখ্যাসহ মূল কথাটি পৌঁছে দিচ্ছে আর যাকে পৌঁছানো হলো সে মূলের আলোকে গবেষণা করে আরও প্রচুর ইলম বের করে আনছে।

এসব হাদীস দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে মূল ভাষ্য থেকে মাসআলা বের করার প্রতি উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ সমর্থন

সাহাবায়ে কেরাম রা. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও অনেক বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন। তাদের এ ইজতিহাদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থনও করেছেন। এ জাতীয় ঘটনার পরিমাণ এত অধিক যে, সবগুলো জড়ো করলে তাওয়াতুর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে ইজতিহাদ ও কিয়াসকে শরয়ী দলীল স্বীকার না করে গত্যন্তর থাকে না। যেমনঃ

(ক) খন্দক যুদ্ধের শেষ দিন একদল সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযায় পৌঁছা ব্যতীত আসরের নামায না পড়ে। পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার উপক্রম হলো। একদল সাহাবী নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশের ওপর আমল করতঃ সূর্যাস্তের পর বনু কুরাইযায় গিয়ে আসর পড়লেন। আরেক দল সাহাবী নবীজীর নির্দেশ থেকে অভীষ্ট লক্ষ্যে যথা দ্রুত পৌঁছার বিধান বের করে সেমতে পথিমধ্যে সময় মতো আসর পড়ে নিলেন। অতঃপর এ ব্যাপারে অবগত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের কাউকেও তিরস্কার করেননি। (বুখারী শরীফ ৪১১৯)

(খ) নামাযের জন্য লোকজনকে কিভাবে জমায়েত করা যায় এ মর্মে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, নামাযের সময় পতাকা ওড়ানো হোক। লোকেরা পতাকা দেখে একে অপরকে জানিয়ে দিবে। মতটি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হলো না। কেউ বললেন, শিঙ্গা বাজানো হোক। নবীজী ইরশাদ করলেন, এটা তো ইয়াহুদীদের কাজ। কেউ পরামর্শ দিলেন, ঘণ্টাধ্বনি দেওয়া হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো নাসারারা করে থাকে। (সুনানে আবূ দাউদ ৪৯৮)

এখানেও সাহাবায়ে কেরাম নিজস্ব কিয়াস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম পরামর্শ পেশ করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো খণ্ডন করেছেন বটে কিন্তু কাউকে ভর্ৎসনা করেননি।

(গ) আরবগণ ইস্তিঞ্জার সময় সাধারণত ঢিলা ও পানির যে কোনো একটি ব্যবহার করত। কুবার অধিবাসীরা ইজতিহাদ করে ঢিলা ও পানির সমন্বয় ঘটাল। আল্লাহ তাদের প্রশংসায় আয়াত নাযিল করলেন, 'সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।' (সূরা তাওবা ১০৮)

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা এমন কী

আমল শুরু করেছো, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বললেন, আমরা (ঢিলার সঙ্গে)পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করি।(জামে তিরমিযী ৩১০০)

দেখা যাচ্ছে, কুবার অধিবাসীরা নবীজীকে না জানিয়ে নিজেরা ইজতিহাদ করে ইস্তিঞ্জার নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। ইজতিহাদকে বৈধ মনে না করলে তারা কখনও এটা করতেন না। হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে এ জাতীয় বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা দৃষ্টে বুঝে আসে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই তাদেরকে ইজতিহাদ করতে নিষেধ করেননি বরং সমর্থন করেছেন এবং ইজতিহাদে ভুল হলে তা শুধরে দিয়েছেন।

শরয়ী কিয়াস যেহেতু ইজতিহাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাই উপর্যুক্ত দলীলগুলোই কিয়াসের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়াও কুরআন সুন্নাহয় শরয়ী কিয়াসের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছেঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় বন্য শিকারকে হত্যা করো না, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক তা হত্যা করবে, তার ওপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে। এর (আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা করে দেবে তোমাদের মধ্যে হতে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি..।' (সূরা মায়িদা ৯৫)

ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একটি বস্তুকে তার সমপর্যায়ের অনুরূপ ও সদৃশ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে তার ওপর বিধান আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটাই কিয়াস। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওরা ফাজলিহী ২/৮৬৯)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فاعتبروا يااولي الابصار

...অতএব হে চক্ষুষ্মানেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (সূরা হাশর-২)

ইমাম আবূ বকর জাসসাস রহ. বলেন, ইবরাহীম ইবনে উলাইয়া রহ. এই আয়াত দ্বারা কিয়াস প্রমাণ করেছেন। এভাবে যে, আয়াতে اعتبار এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ'তেবার হলো অতিক্রম করা, এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুর দিকে যাওয়া। কিয়াসের মধ্যেও এই অর্থ পাওয়া যায়। কারণ কিয়াস অর্থ হলো কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত মূল বিধানটি শাখার ওপর আরোপ করা। (উসুলুল জাসসাস ২/২১২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কিয়াস করণ

ক) এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে, এতেও কি সে সওয়াব লাভ করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

তোমার কি ধারণা, সে যদি হারাম পন্থায় তার চাহিদা পূরণ করতো তাহলে কি গোনাহগার হতো না? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তাতো হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক তেমনি বৈধভাবে বাসনা পূরণের মাধ্যমেও সওয়াব লাভ করবে। কি মনে কর? তোমাদের মন্দের বদলা দেওয়া হবে আর ভালোর প্রতিদান দেওয়া হবে না।... (মুসলিম শরীফ ১০০৬)

খ) এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি কালো বর্ণের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। (অথচ আমরা স্বামী স্ত্রী কেউ কালো বর্ণের নই।) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উট আছে? সে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। জিজ্ঞেস করলেন সেগুলো কি বর্ণের? বলল, লাল বর্ণের। জানতে চাইলেন, লাল উটের গর্ভজাত ছাই বর্ণের উট নেই? বলল, আছে। জিজ্ঞেস করলেন, (লাল বর্ণের নরমাদীর প্রজনন সত্ত্বেও তাদের গর্ভজাত ছাই রঙা উট) কোথা থেকে আসল? বলল কোনোও রগ তাকে টেনে এনেছে। (অর্থাৎ পূর্বে তার বংশে এই বর্ণের উট ছিল।...) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার এই ছেলেকেও হয়তো কোনো রগ টেনে এনেছে। (বুখারী শরীফ ৫৩০৫, ৬৮৪৭)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীকে কিয়াসের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন যে, লাল উট কখনও ছাই বর্ণের উট জন্ম দেয় যখন তার বংশে এই বর্ণের উট থাকে। তেমনি ফর্সা দম্পতির সন্তানও কালো বর্ণের হয় যখন তার উর্ধ্বতন কেউ কালো বর্ণের থাকে।

গ) হযরত উমর ফারুক রা. একবার নবীজীর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি বড় একটি অপরাধ করে ফেলেছি। আমি রোযা রেখে স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি ধারণা তুমি যদি রোযা অবস্থায় পানি দিয়ে কুলি করতে (তাহলে রোযার কোনো ক্ষতি হতো?) হযরত উমর রা. বললেন, না এতে তো কোনো ক্ষতি দেখছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চুম্বনও অনুরূপ একটি ব্যাপার। (সহীহ সনদে সুনানে আবূ দাউদ ২৩৮৫)

ঘ) জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাইলেন, আমার মা হজ্জের মান্নত করেছিল। কিন্তু হজ্জ না করেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। এখন আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করব? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তোমার মায়ের ওপর কোনো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে না? (অবশ্যই করতে) কাজেই তোমরা আল্লাহর ঋণও আদায় কর। আল্লাহ তা‘আলা ঋণ আদায়ের অধিক হকদার। (বুখারী শরীফ ১৮৫২)

ঙ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বংশ সম্পর্কের কারণে যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন দুধপান জনিত কারণেও তাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। (জামে তিরমিযী ১১৪৬)

এখানে দুধ পানজনিত সম্পর্ককে বংশসম্পর্কের ওপর কিয়াস করা হয়েছে।

চ) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক, না নাপাক এ সম্পর্কে নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একটি আয়াতের ওপর কিয়াস করে (যেখানে বারবার অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা কঠিন হওয়ার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ের জন্য তা শিথিল করা হয়েছে) বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে পাক বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৯২, কুরতুবী ১২/২৮০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবা কর্তৃক কিয়াস

১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ দ্বারা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, যদি কিতাবুল্লাহয় না পাও? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা। আবার বলা হল, যদি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ কোনোটিতে না পাও? তিনি জবাব দিলেন, আমি আমার রায় দ্বারা গবেষণা করে ফায়সালা করবো এবং চেষ্টার কমতি করবো না। তাঁর এ জবাবে নবীজী অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন।(সুনানে আবূ দাউদ ৩৫৯২)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কারণ হাদীস দৃষ্টে বোঝা যায় উম্মত এমন বিষয়েরও সম্মুখীন হবে যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্টরূপে থাকবে না। সে ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর সিদ্ধান্তের আলোকে কিয়াস করেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

২. হযরত আম্মার রা. এর বর্ণনা, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক যুদ্ধে পাঠালেন। এক পর্যায়ে আমার গোসল ফরজ হল। গোসল করব এ পরিমাণ পানিও ধারে কাছে ছিল না। এজন্য গোসলের বিকল্প হিসেবে আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম ঠিক যেমন কোনো প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি খায়। মদীনায় ফিরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলাম। শুনে তিনি বললেন, তোমার জন্য দুই হাত মাটিতে মেরে (ধুলা-বালি) ঝেড়ে মুখমণ্ডল আর দুই হাত (কনুই পর্যন্ত) মাসাহ করে নিলেই যথেষ্ট ছিল। (মুসলিম শরীফ ১৬১)

দেখা যাচ্ছে হযরত আম্মার রা. উযূর তায়াম্মুমের ওপর গোসলের তায়াম্মুমকে কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ উযূর বদলে যেমন তায়াম্মুম হয় গোসলের বদলেও তায়াম্মুম হবে। কিন্তু কিয়াসে সামান্য ভুল হওয়ায় নবীজী তা শুধরে দিয়েছিলেন

যে, তোমার কিয়াস তো ঠিক কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম উযূর তায়াম্মুমের মতই হবে। ভিন্ন রকম হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কিয়াস করতে তাকে নিষেধ করেননি।

এ ঘটনা এক মস্তবড় দলীল যে, সাহাবায়ে কেরামও বিধান অজ্ঞাত বিষয়ের সম্মুখীন হলে তার সমাধানে কিয়াসের সহায়তা নিতেন।

এ সমস্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হল, কিয়াস শরী'আতের মজবুত দলীল। এছাড়া দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। সুতরাং এর অস্বীকার গোমরাহী। যারা এটাকে অস্বীকার করে তাদের তাওবা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাকলীদঃ

তাকলীদের পরিচয় ও গুরুত্বঃ

ইসলামী শরী'আতের মৌলিক চার দলীল সম্পর্কে জানার পর কথা হল, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের সামগ্রিক জীবনের সকল অঙ্গনের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান এই চার দলীলের মধ্যেই নিহিত। এটা নিছক কোনো দাবী নয়। পৃথিবী সর্বযুগেই এর বাস্তবতা চাক্ষুষ করে আসছে। তবে এ দলীল চতুষ্টয় থেকে সরাসরি সমস্যার সমাধান খুঁজে নেওয়া বা পাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য নবীযুগ থেকেই নিয়ম চলে আসছে যে, উম্মতের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ ও তা থেকে উৎসারিত ইলমে দ্বীন সম্পর্কে একটি দল পারদর্শিতা অর্জন করবে আর অন্যরা কুরআন সুন্নাহর বিধানাবলী জানার জন্য তাদের দারস্থ হবে এবং তাদের ব্যাখ্যা ও দিক নির্দেশনা অনুসারে কুরআন সুন্নাহ অবগত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।

এভাবে কুরআন সুন্নাহয় পারদর্শীদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নিকট থেকে শরয়ী বিধান এবং তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি আস্থাশীল হয়ে তাদের বর্ণিত শরী'আতের বিধান মেনে নেয়াকে পরিভাষায় তাকলীদ বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে বিধিবিধান মেনে চলা শরী'আতের শিক্ষার পাশাপাশি স্বভাবজাত বিষয়ও বটে। দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে সবই এ নিয়মের অধীন। এটা এড়িয়ে চলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি পার্থিব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও মানুষকে বিজ্ঞজনদের দারস্থ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কেউ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে না। বিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের দিক নির্দেশনা অনুসারে চলাকে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করে। নিজের মনমতো চলাকে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী জ্ঞান করা হয়। এটা ধন্যবাদযোগ্য একটি গুণ। আর বাস্তবেও তা সহজ ও নিরাপদ। যারা এ নিয়ম মেনে চলে তারা সফল হয় আর হঠকারীরা হয় ব্যর্থমনোরথ। এটা কুরআনেরও নির্দেশনা যে, কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে। (সূরা আম্বিয়া-৭) ইসলাম তো সাধারণ দুনিয়াবী

সফরেও একাকী বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রেই একজনকে আমীর বানিয়ে চলার নির্দেশ জারী করেছে। এতে অনুমান করা যায় আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের সুকঠিন ও সংবেদনশীল সফরে কুরআন সুন্নাহর সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে হলে খাইরুল কুরুনের ইলম-আমল, তাকওয়া-তাহারাতে সকলের আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের, যাদের ইলম এখনও পর্যন্ত সুবিন্যস্ত আকারে বিদ্যমান, তাকলীদ বা অনুসরণ করা কতটা জরুরী। উপরন্তু বর্তমানের ধর্মহীনতার নাযুক সময়ে তো এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। আহলে হাদীস বলে পরিচিত তাকলীদ অস্বীকারকারী বন্ধুদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী বলেন, ‘আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা যে, যারা অজ্ঞতাবশতঃ মুজতাহিদে মুতলাক ও মূল তাকলীদকে বর্জন করে শেষতক তারা ইসলামকেই বিদায় দিয়ে দেয়। (আসারুল হাদীস ড. খালিদ মাহমুদ ২/৩৮৫)

হক্কানী উলামায়ে কেরামের অভিজ্ঞতা হলো, বর্তমানে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার সহজ পথ হলো, চার ইমামের তাকলীদ থেকে বের হয়ে যাওয়া।

সংক্ষিপ্ত করে তাকলীদের পরিচয় ও গুরুত্ব তুলে ধরার পর এ পর্যায়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাকলীদ বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম অন্য সাহাবার তাকলীদ করেছেন। এরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিকভাবে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট করে কারো তাকলীদের স্বীকৃতি দিয়েছেন কিংবা কারও তাকলীদকে সমর্থন করেছেন। আবার কখনও তিনি গভর্ণর বানিয়ে একেক এলাকায় সাহাবায়ে কেরামকে পাঠিয়ে দিতেন এবং ওই এলাকার লোকদেরকে ওই সাহাবীকে তাকলীদ করে দ্বীনের উপর চলতে বলতেন। স্বল্প পরিসরে এগুলোর উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

(ক) পরবর্তীদের জন্য সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদের অনুসরণ

হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কয়েকজন সাহাবীকে জামা‘আতে বিলম্বে আসতে দেখে বললেন, তোমরা দ্রুত আসো এবং আমাকে দেখে দেখে অনুসরণ করো, তোমাদের পরবর্তী লেকেরা তোমাদের দেখে দেখে অনুসরণ করবে। (মুসলিম শরীফ ৪৩৮)

ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

এই হাদীসে সাহাবা পরবর্তীদের জন্য সাহাবাদের তাকলীদের সুস্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে।

www.muslimdm.com

হাদীসে এসেছে, আমার উম্মত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি ছাড়া সকলেই জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই এক দলে কারা থাকবে। বললেন, ماانا عليه واصحابي অর্থাৎ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর থাকবে। (জামে তিরমিযী ২৮৩২)

এখানেও সাহাবীদের তাকলীদকে পরবর্তীদের জন্য নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) পরবর্তীদের জন্য নির্দিষ্ট সাহাবীদের তাকলীদের স্বীকৃতি

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জানি না কতদিন তোমাদের মাঝে (জীবিত) থাকব। আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও উমর রা. এ দু‘ব্যক্তির ইকতিদা (অনুসরণ) করবে। (জামে তিরমিযী ৩৬৬৩)

হাদীসে ইকতিদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইকতিদা অর্থ দ্বীনি বিষয়ে কারও অনুসরণ করা। এর নামই তাকলীদ।

হযরত হুরাইস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য তাই পছন্দ করি যা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তোমাদের জন্য পছন্দ করে। (মুস্তাদরাক ৫৩৯৪)

এই হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর পছন্দনীয় বিষয়গুলো সাহাবায়ে কেরামের জন্য অনুসরণীয় বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটাই তাকলীদ।

হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতানৈক্য লক্ষ্য করবে। তোমরা দ্বীনের নামে উদ্ভাবিত সকল বিষয় পরিহার করে চলবে। কেননা নিঃসন্দেহে তা গোমরাহী। তোমাদের কেউ বিদআতী কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে তার করণীয় হল আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা। কাজেই মাড়ির দাঁত দ্বারা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে রাখবে। (তিরমিযী শরীফ ২৬৭৬)

এই হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিজের সুন্নাতের সাথে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তাকলীদ তো এরই নাম।

(গ) নবীজীর জীবদ্দশায় সাহাবীর তাকলীদের সমর্থন

হযরত সাহাল ইবনে মুআয রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী জিহাদে শরীক হয়েছেন। তিনি থাকা অবস্থায় আমি তার নামায ও

www.muslimdm.com

অন্যান্য সকল আমল অনুসরণ করতাম। এখন তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমাকে এমন কোনো আমল বাতলে দিন যা তার স্থলাভিষিক্ত হবে। (মুস্তাদরাক ২৩৯৭)

এই হাদীসে মহিলার জন্য ইলমওয়ালা দ্বীনদার স্বামীর ইকতিদা ও অনুসরণকে সমর্থন করা হয়েছে। এরই নাম তাকলীদ।

(ঘ) গভর্নর হিসেবে এবং দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. ও হযরত আবূ মুসা আশআরী রা. কে ইয়ামানের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর করে প্রেরণ করেছিলেন। (বুখারী শরীফ ৪৩৪১)

বলা বাহুল্য, তারা সেখানকার জনগণকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যা বুখারী শরীফের আরেকটি রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। (বুখারী শরীফ ১৩৯৫)

দেখা যাচ্ছে হযরত মুআয ইবনে জাবাল ও হযরত আবূ মুসা আশআরী রা. কে ইয়ামানবাসীর নিকট দ্বীনী বিষয়ে অনুসরণীয় হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এটাই তাকলীদ। কারণ প্রত্যেক ব্যপারে ইয়ামানবাসীদের পক্ষে মদীনায় এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাসআলা জেনে যাওয়া সুকঠিন ব্যাপার ছিল।

অনুরূপ বিভিন্ন কওমের প্রতিনিধিগণ মদীনায় এসে দ্বীনি বিষয়ে অবগত হয়ে ফিরে গিয়ে কওমকে তা শিক্ষা দিতেন আর কওমও নির্দ্বিধায় বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের কথা মেনে নিতো। এর বহু দৃষ্টান্ত হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

প্রতীয়মান হল নিরাপদে দ্বীনের অনুসরণ করতে হলে তাকলীদে শাখসী বা নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ও ইমামের তাকলীদ করা জরুরী। এটাকে হারাম বা শিরক বলা মারাত্মক পর্যায়ের গোমরাহী। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমাকে এ জাতীয় ফিতনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কিয়াস-ইজতিহাদ ও তাকলীদ সাহাবাযুগে কিয়াস ও ইজতিহাদের নমুনা

নমুনা-১

মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত নেই কিন্তু দাদা বেঁচে আছেন, এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির ভাই তাঁর দাদার বর্তমানে ওয়ারিশী সম্পত্তি লাভ করবেন কি না এ নিয়ে জটিলতা দেখা দিল। কুরআন বা হাদীসে এর কোনো স্পষ্ট বিধান না থাকায় ফকীহ সাহাবীগণ থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের মতামত পাওয়া গেল। একদল বললেন, মীরাস পাবে। আর অপর দল না পাওয়ার পক্ষে রায় দিলেন। পাওয়ার পক্ষে মত দিলেন হযরত আলী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত যায়েদ

ইবনে সাবেত রা. প্রমুখ সাহাবী। সমস্যা নিরসনে হযরত উমর ফারুক রা. হযরত আলী রা. ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত আলী রা. তার মতের স্বপক্ষে কিয়াস পেশ করলেন, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! ধরুন একটি বৃক্ষ থেকে একটি শাখা বের হল। তারপর শাখাটি থেকে আরও দুটি প্রশাখা উদগত হল। এক্ষেত্রে আপনার মতে প্রথম শাখাটির কে অধিক নিকটবর্তী? স্বয়ং বৃক্ষটি না তার উদ্গত প্রশাখাদ্বয়? হযরত উমর ফারুক রা. বললেন উভয়ে সমান, অর্থাৎ স্বয়ং বৃক্ষ ও উদগত প্রশাখাদ্বয় উভয়-ই প্রথম শাখাটির সমান নিকটবর্তী। হযরত আলী রা. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! ভাই আর দাদার সম্পর্কও মৃতব্যক্তির সঙ্গে অনুরূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে ভাই দাদার সঙ্গে মীরাস লাভ করবে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! বলুন তো কোনো নদী থেকে একটি নালা বের হল, অতঃপর সেই নালা থেকে আরও দুটি উপনালা সৃষ্টি হল। এক্ষেত্রে নালাটির কে অধিক নিকটবর্তী। নদীটি না উপনালা দুটি? আমীরুল মুমিনীন বললেন, উভয়ই সমান নিকটবর্তী। এবার যায়েদ রা. বললেন, মাইয়েতের সঙ্গে ভাই আর দাদার অবস্থাও অনুরূপ। সাহাবীদ্বয়ের কিয়াস দর্শনে হযরত উমর রা. এর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভাই দাদার সঙ্গে মীরাস লাভ করবে।

লক্ষ্যণীয় হল, হযরত আলী রা. এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. দুজনেই আমীরুল মুমিনীনকে কিয়াসের মাধ্যমে জবাব দিলেন। আর আমীরুল মুমিনীনও তা মেনে নিলেন। শুধু তিনি কেন সকল সাহাবীই তাদের এ কিয়াস মেনে নিলেন। কেউ একথা বললেন না যে, শরী'আতের ব্যাপারে কিয়াস কেন সরাসরি কুরআন হাদীস পেশ করুন। কেননা তাদের জানা ছিল যে, সহীহ কিয়াস শরী'আতেরই একটি দলীল। (জামিউল মাসানিদ খাওয়ারেজমী কৃত ২/৩৩৮)

নমুনা-২

মদ পানকারীকে কত বেত্রাঘাত করা হবে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ ছিল। কারো বক্তব্য ছিল ৪০টি আর কারো মত ছিল ৮০টি। হযরত উমর রা. এ ব্যাপারে হযরত আলী রা. এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী রা. বললেন, আমার মতে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হোক। কারণ যখন সে পান করে নেশাগ্রস্ত হয়। নেশাগ্রস্ত হলে প্রলাপ বকতে থাকে। আর প্রলাপ বকতে বকতে কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করে বসে। (আর অপবাদ আরোপের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত) তারপর হযরত উমর রা. মদপানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করার সিদ্ধান্ত দিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক হাদীস নং ৯৯৫)

দেখা যাচ্ছে, হযরত উমর রা. হযরত আলী রা. এর কিয়াসের ভিত্তিতে শরয়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করলেন।

নমুনা-৩

একবার এক গোত্রের কিছু লোক এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর নিকট জানতে চাইল, জনাব! আমাদের এক ব্যক্তি বিবাহ করেছে, কিন্তু মহর নির্ধারণ করেনি। তারপর সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছে। এখন তার মহরের ব্যাপারে কি ফায়সালা হবে? হযরত আবদুল্লাহ রা. বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার নিকট এর চেয়ে জটিল কোনো সমস্যা উপস্থিত হয়নি। তোমরা এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও জিজ্ঞাসা কর। তারপর ব্যাপারটি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একমাস পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। পরিশেষে তাঁরা আবারও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর দারস্থ হয়। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে সমাধান দিচ্ছি। সঠিক হলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে আর ভুল হলে আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত। অতঃপর তিনি সকলের সামনে তাঁর ইজতিহাদ তুলে ধরলেন যে, এ মহিলা মহরে মিছিল পাবে, তার মৃত স্বামীর ওয়ারিশ হবে এবং চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। এ ফায়সালা শোনার পর তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে গেছে। আমাদের গোত্রীয় বিরওয়া বিনতে ওয়াসিক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারে স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. স্বীয় কিয়াস সহী হওয়ার দলীল জানতে পেরে এত বেশী খুশি প্রকাশ করলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতোটা আনন্দ কখনো প্রকাশ করেন নি। (উসুলুল জাসসাস ২/২৩০)

নমুনা-৪

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রা. এর খলীফা নিযুক্ত করণের বিষয়টিও সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ দ্বারা হয়েছিল। কেননা কুরআন হাদীসের কোথাও একথা নেই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তিনিই সর্বপ্রথম খলীফা হবেন। (উসুলুল জাসসাস ২/২৩০)

শরী‘আতে ইসলামিয়ায় এ জাতীয় আরও বহু মাসআলা রয়েছে যেগুলো সাহাবায়ে কেরামের কিয়াস ও ইজতিহাদ দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত সাহাবায়ে কেরাম কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন:

১.হযরত উমর রা. ২. হযরত আলী রা. ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ৪. উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. ৫. যায়েদ ইবনে সাবিত রা. ৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.।

এদের পরবর্তী ছিলেন, ১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. ২. হযরত উম্মে সালামা রা. ৩. উসমান ইবনে আফফান রা. ৪. আনাস ইবনে মালেক রা. ৫. আবূ সাইদ খুদরী রা. ৬. আবূ হুরায়রা রা. ৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ৮. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ৯. আবূ মুসা আশআরী রা. ১০. সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. ১১. সালমান ফারসী রা. ১২. মুআয ইবনে জাবাল রা. ১৩. তালহা রা. ১৪. যুবাইর রা. ১৫. আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ১৬. মুআবিয়া রা. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সাহাবাযুগের কিয়াস ও ইজতিহাদ সংক্রান্ত উপর্যুক্ত প্রামাণ্য আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল, কিয়াস ও ইজতিহাদ ভূঁইফোড় কোনো বিষয় নয়। বরং তা শরী'আতের দলীল চতুষ্টয়ের অন্যতম। এ ব্যাপারে সংশয় পোষণ করা গোমরাহী ও ইলমী দৈন্যের পরিচায়ক।

সাহাবাযুগে তাকলীদঃ

সাহাবায়ে কেরাম রা. উম্মতের জন্য দ্বীন পালনের নমুনা ও মাপকাঠি। তারা যেভাবে কুরআন, সুন্নাহর উপর আমল করেছেন, সফলতা পেতে হলে উম্মতকে সেভাবে পথ চলতে হবে। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম সকলে ইলমে দ্বীন চর্চাকে নিজের পেশা বানাননি। তারা বিভিন্ন ধরনের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। অল্পসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামই ইলম চর্চাকে নিজের পেশার মত বানিয়ে নিয়েছিলেন। সাধারণ নিয়মও এই যে, সকল মানুষ একই ধরনের পেশা ও কাজ অবলম্বন করেন না। প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজে মশগুল হয়। যাতে দ্বীন দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ কাজের ধারা সচল থাকে। এজন্যই দেখা যায় পৃথিবীতে সকলেই এক জাতীয় পেশা গ্রহণ করে না। একেক জন একেক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে ও বিশেষজ্ঞ হয়। আর অন্যরা সে ব্যাপারে তাকে মেনে চলে ও তার থেকে উপকৃত হয়। এটা এমন এক নিয়ম যার কোনো ব্যত্যয় নেই।

সাহাবায়ে কেরামও এই নিয়মের আওতার বহির্ভূত ছিলেন না। সে হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবী ইলমে দ্বীন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারা কুরআনে কারীম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তারা কারী, হাফেজে কুরআন, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুফতী নামে পরিচিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সার্বিক ব্যাপারে তারাই সিদ্ধান্ত দিতেন। যে ব্যাপারে কুরআন হাদীসে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতো তারা সে ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে ফায়সালা দিতেন। কুরআন হাদীসে পাওয়া না গেলে নিজ নিজ

ইজতিহাদ ও কিয়াস দ্বারা তার সমাধান দিতেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বিনাবাক্যে তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ (তাকলীদ) করতেন। সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে ফায়সালাকারী মানতেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ফিকহী মাযহাব সাহাবায়ে কেরামের যুগেই বিদ্যমান ছিল। তবে তা শাস্ত্র আকারে সংকলিত ছিল না। মনে রাখতে হবে কোনো বিষয় শাস্ত্র আকারে সংকলিত না হওয়া তার অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ নয়। উদাহরণত: কুরআন অবতরণের যুগে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র আকারে সংকলিত ছিল না। কিন্তু কুরআন নাযিলের শত শত বছর পূর্ব থেকেই আরবগণ ব্যাকরণসম্মত আরবীতে কথা বলে ও সাহিত্য চর্চা করে এসেছেন। যাহোক কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন মাযহাবের ইমাম। আর অন্যান্যরা তাদের ফিকহী মতামত অনুসরণ করে চলতেন। অর্থাৎ তারা ইমাম সাহাবীদের তাকলীদ করতেন। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এর বর্ণনা দেখুন। তিনি তার এক রচনায় সেসব ফকীহ সাহাবীর আলোচনা করেছেন যাদের শিষ্যগণ তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলো সংরক্ষণ করেছেন। আর তাদের মাযহাব ও তরীকার উপর আমল ও ফাতাওয়া চালু ছিল। তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ধরনের ব্যক্তি ছিলেন ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ২. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। এরপর হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. তাদের প্রত্যেকের মাযহাব অনুসরণকারী ও সে মোতাবেক ফাতাওয়া প্রদানকারী ফকীহ তাবেঈদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর যে শিষ্যগণ তার কিরাআত অনুযায়ী লোকদেরকে কুরআন শিখাতেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন এবং তার মাযহাব অনুসরণ করতেন, তারা হলেন, ১. হযরত আলকামা রহ. ২. হযরত আসওয়াদ রহ. ৩. হযরত মাসরূক রহ. ৪. হযরত আবীদাহ রহ. ৫. হযরত আমের ইবনে শুরাহবীল রহ. ৬. হযরত হারিস ইবনে কায়েস রহ. প্রমুখ। অতঃপর ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ফকীহ শিষ্যদের সম্পর্কে ও তাদের মাযহাব বিষয়ে পরবর্তীদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ছিলেন, ইবরাহীম নাখায়ী ও আমের ইবনে শুরাহবীল রহ.। তারপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ও তার সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণকারী ও তদানুযায়ী ফাতাওয়া প্রদানকারী বারোজন ফকীহর নাম উল্লেখ করে বলেন, এদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সাবিতের মাযহাব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহইয়া ইবনে যায়দ আনসারী, আবূ যিনাদ ও আবূবকর ইবনে হাযম। অতঃপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মতামত সংরক্ষণকারী ও তার প্রচার প্রসারকারীদের নাম উল্লেখ করেন। (কিতাবুল ইলাল ১৩৫-১৫৭)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, একবার মদীনা শরীফ থেকে কিছু লোক হজ্ব করতে মক্কা শরীফ এসেছিল। বিদায়ের সময় তাদের এক মহিলা বিদায়ী তওয়াফের পূর্বেই ঋতুমতী হয়ে পড়ে। তারা মক্কার মুফতী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট ফাতাওয়া জানতে চান। তিনি ফাতাওয়া দিলেন, এই মহিলার বিদায়ী তাওয়াফ মাফ হয়ে যাবে। তারা বলল, আমাদের মদীনার মুফতী যায়েদ ইবনে সাবিত তো বলেন, এ ধরনের মহিলা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে অতঃপর বিদায়ী তওয়াফ করে দেশে ফিরে যাবে। আমরা তার মতামত কিভাবে উপেক্ষা করব? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাদেরকে বললেন, তোমরা মদীনার উম্মে সুলাইমকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হযরত সাফিয়্যা রা. এ অবস্থার সম্মুখীন হলে তিনি তাকে আমার মতই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হজ্ব হাদীস নং ১৭৫৮, ১৭৫৯)

মদীনা শরীফের উক্ত হাজীদের এ মন্তব্য সবিশেষ লক্ষণীয় যে, আমরা কিভাবে যায়েদ ইবনে সাবিতের মতামত উপেক্ষা করব। এই মন্তব্য একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তারা সর্ব ব্যাপারে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর মাযহাবের (সিদ্ধান্তসমূহ) তাকলীদ করতেন।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল, তাকলীদের বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। আর থাকবে নাই বা কেন, তারাতো নিজেদেরকে ডক্টর আর আযহারী মনে করতেন না। তারা চাইতেন যে ব্যাপারে নিজেদের জানা নেই তা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে জেনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। এভাবে আমল করাকে তারা সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। কারণ তারা ছিলেন প্রকৃতই সত্যের অনুসন্ধানী। আর বর্তমানের গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের কাণ্ড-কারখানা নিয়ে তাদের প্রখ্যাত ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কত সুন্দর বলেছেন, (বর্তমান যামানায় গাইরে মুকাল্লিদ (আহলে হাদীস) ভাইদের না আছে সঠিক পথ লাভ করার চিন্তা-ভাবনা, আর না আছে সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধান। তারা শুধু সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দু'চারটি ফিকহী মাসআলা প্রচার করে তাদের বিভ্রান্ত করছেন। (আল হিত্তাহ ফি যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ এর ভূমিকা পৃ: ১৫৩)

আল্লাহই ভালো জানেন এতে তাদের কি লাভ? মুসলমানদের ইজতিমায়ী জীবনে ফাটল ধরানো তো দ্বীনের মারাত্মক ক্ষতি।

তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে কিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ:

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ ও সাহাবাযুগের কিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ নিয়ে আলোচনার পর আমরা তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগের কিয়াস ইজতিহাদ ও তাকলীদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যাতে খাইরুল করুনের গোটা সময়ে কিয়াস ইজতিহাদ ও তাকলীদের উপস্থিতি আমাদের

www.muslimdm.com

সামনে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং তাকলীদ অস্বীকারের গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়।

স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিয়াস ও ইজতিহাদ জারি করে গিয়েছিলেন, সাহাবাযুগ হয়ে তা তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের সময়ও হুবহু বরং আরও বেগবান হয়ে অব্যাহত থাকে। নিম্নে তার কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো।

১. বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত শুরাইহ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রা. তাঁর নিকট প্রেরিত এক পত্রে লিখেছেন, যখন তোমার সামনে কোনো সমস্যা উত্থাপিত হবে, তুমি কিতাবুল্লাহ থেকে তার সমাধান দিবে। কিতাবুল্লাহয় না পেলে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে সমাধান দিবে। যদি সুন্নাহর মধ্যেও সমাধান না পাও তাহলে সাহাবা কেরামের ইজমা দ্বারা সমাধান দিবে। যদি কিতাব সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবায়ও সমাধান না পাও তাহলে তোমার ইজতিহাদ অনুযায়ী সমাধান দিয়ে দিবে। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলেছেন, তাহলে তোমার ইচ্ছা ইজতিহাদ করেও ফায়সালা দিতে পারো কিংবা বিরতও থাকতে পার। এটাই তোমার জন্য নিরাপদ পন্থা।(জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী ২/৭৪৬, দারেমী ১/৪৬)

২. তাবেঈ হযরত আবূ আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রহ. থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর নিকট বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ সমবেত হন। তিনি তাদেরকে উপরিউক্ত উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন, ইজতিহাদ করতে গিয়ে কেউ সন্দেহমূলকভাবে কিছু বলতে পারবে না। যেমনঃ আমার মনে হয় বা আমার ভয় হয় এজাতীয় শব্দ বলবে না। যা বলার সুস্পষ্টভাবে বলবে। কারণ হালাল-হারাম স্পষ্ট বিষয়। (দারেমী ১/৪৬, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হা নং ১৫৯৭)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন, আর যদি (ইজতিহাদের মূলনীতি না জানার কারণে) কেউ ইজতিহাদ না করতে পারে তাহলে তা স্বীকার করতে সে যেন লজ্জাবোধ না করে।

৩. ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, আমি ইমাম যুহরী রহ. এর নিকট শুনেছি, বিশুদ্ধ কিয়াস ইলমে দ্বীনের উত্তম সাহায্যকারী। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬১৫)

৪. আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান রহ. বিশিষ্ট তাবেঈ হাসান বসরী রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আপনি লোকজনের মাসআলা মাসাইলের কিভাবে সমাধান দেন, সব বিষয়ই কি সাহাবীদের থেকে শোনা কথা, নাকি এ ব্যাপারে ইজতিহাদও করে থাকেন? হাসান বসরী রহ. উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ আমাদের সব ফাতাওয়াই সাহাবীদের থেকে শোনা নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ইজতিহাদ করে মানুষের জন্য অধিক কল্যাণের পথ খুঁজে বের করি যা

www.muslimdm.com

তারা নিজেরা বের করতে পারে না। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬১৯ তাবাকাতু ইবনে সাদ ৭/১৬৫)

৫. হযরত হাম্মাদ রহ. বলেন, আমি ইবরাহীম নাখায়ীর চেয়ে উপস্থিত ইজতিহাদে যোগ্য আর কাউকে দেখিনি। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬২০)

৬. হযরত রাবীআহ রহ. একবার ইমাম যুহরী রহ. কে জিজ্ঞেস করেন, কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে আপনি কিভাবে তার উত্তর দেন? তিনি বলেন, আমি প্রথমে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা জবাব দেই, সেখানে না পেলে সাহাবীদের বক্তব্য দ্বারা দেই তাতেও না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ করে উত্তর দেই। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬২১)

৭. হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, সব মাসআলা আমাদের জানা থাকে না, অর্থাৎ সরাসরি সুন্নাহয় উল্লেখ থাকে না। বরং আমরা একটা মাসআলা দ্বারা অন্যটি চিহ্নিত করি এবং একটা জানা মাসআলার উপর অজানা মাসআলাকে কিয়াস করি। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬৪৬)

৮. ইমাম শা'বী রহ. বলেন, গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে চল্লিশোর্ধ্ব সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কিয়াস করে আমল করি।(জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬৪৫)

হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. তার কিতাবে তাবেঈদের বিশাল এক জামা'আতের নাম উল্লেখ করেছেন যারা মাসাইলের সমাধানে নুসুসে শরয়ীর অবর্তমানে ইজতিহাদ করে জবাব দিয়েছেন। বিভিন্ন শহরে উক্ত খিদমতে নিয়োজিত কয়েকজন বিশিষ্ট তাবেঈর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) মদীনাঃ সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে শিহাব প্রমুখ।

(খ) মক্কা ও ইয়ামানঃ মুজাহিদ, ত্বাউস, ইবনে জুরাইজ প্রমুখ।

(গ) কুফাঃ আলকামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম নাখায়ী, শুরাইহ, হাম্মাদ ও ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ।

(ঘ) বসরাঃ হাসান বসরী, ইবনে সিরীন প্রমুখ।

(ঙ) শামঃ মাকহুল, আউযায়ী, সুলাইমান ইবনে মুসা প্রমুখ।

(চ) মিসরঃ ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীব, আমর ইবনে হারেস, লাইস ইবনে সাদ প্রমুখ।

কিয়াস ও ইজতিহাদকে শরী'আতের দলীল মনে করে তার ভিত্তিতে ফায়সালা দেওয়া ও আমল করা সংক্রান্ত বহু সংখ্যক আসার তাবেঈদের থেকে বর্ণিত আছে। তার যৎসামান্যই উপরে উল্লেখ করা হল। ইলমে দ্বীনের সঙ্গে যাদের

ন্যুনতম সম্পর্ক আছে এবং যারা দ্বীনের রুচি সম্পর্কে জ্ঞাত তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

তাকলীদ সম্পর্কে তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের উক্তি ও আমল

মুসলমান মাত্রই একথা বিশ্বাস করেন যে, দ্বীনের মূল বিষয় হল কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মেনে চলা ও তার অনুসরণ করা। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণও শুধু এ কারণে ওয়াজিব যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মুখপাত্র ও ব্যাখ্যাকার। কোন জিনিস হালাল, কোনটি হারাম; কোন কাজ বৈধ, কোনটি অবৈধ এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলেরই আনুগত্য করতে হবে। কেউ যদি আল্লাহ ও রাসুলকে বাদ দিয়ে অন্য কারও আনুগত্যের কথা বলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। কাজেই মুসলমানদেরকে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধানই মেনে চলতে হবে, অন্য কারও বিধান নয়।

দুটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। প্রথম কথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিধান এমন আছে যেগুলোর মর্ম কুরআন-হাদীস ও আরবী ভাষা সম্পর্কে সাধারণ বুঝমান ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারে। কারণ এগুলো দ্ব্যর্থহীন এবং সংক্ষেপণ ও সুক্ষ্মতামুক্ত। ফলে এর পাঠক নিঃসংশয়ে তার অর্থ বুঝতে পারবে। যেমন কুরআনের বাণী- لايغتب بعضكم بعضا

আরবী ভাষী মাত্রই জানেন যে, এর অর্থ হল তোমরা একে অপরের অগোচরে নিন্দা করবে না।

পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে যেগুলো দ্ব্যর্থবোধক, সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত। আবার কিছু বক্তব্য বাহিক্য দৃষ্টিতে পরস্পরে সাংঘর্ষিক।

দ্ব্যর্থবোধক বাণীর উদাহরণ: والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قرؤء

তালাক প্রাপ্তা মহিলাগণ তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

আয়াতে বর্ণিত قروء শব্দের দুটি অর্থ ১. হায়েয ২. পবিত্রতা। উক্ত আয়াতে এই দুই অর্থের কোনটি উদ্দেশ্য তা অস্পষ্ট। বলাবাহুল্য হায়েয ও পবিত্রতা এই বিপরীতমুখী দুটি বিষয়ে এক সঙ্গে আমল করা সম্ভব নয়। অথচ কোনো একটার ওপর আমল করতেই হবে। কাজেই দুই অর্থের কোনো একটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ইমামের শরণাপন্ন হয়ে তার তাকলীদ বা অনুসরণের বিকল্প নেই।

অনুরূপ এক হাদীসে এসেছে: لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

ফাতিহা ছাড়া নামায পূর্ণ হয় না।

আর অন্য এক হাদীসে এসেছে: من كان له امام فقراءة الامام قراءة له.
যার ইমাম আছে ইমামের কিরাআত তারই কিরাআত।

এখানে প্রথম হাদীসটি বাহ্যিকভাবে দ্বিতীয়টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে। সুতরাং আমল করতে হলে কোনো ইমামের তাকলীদ করে উভয় হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হল, কুরআন হাদীসে মানবজীবনের সকল বিধি-বিধান বর্ণিত হলেও সব বিধান সুস্পষ্ট ও সরাসরি বর্ণিত হয়নি বরং কোনোটা সরাসরি আবার কোনোটি মূলনীতি আকারে। কাজেই ইজতিহাদের যোগ্য নয় এমন ব্যক্তি কুরআন হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করতে গেলে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে। হয়তো সে আদৌ তা পারবে না। কিংবা পদে পদে ভুল করতে থাকবে। যা হোক কুরআন হাদীস থেকে ব্যবহারিক জীবনের মাসআলা মাসাইল আহরণ করতে হলে আমাদের জন্য মাত্র দুটি পথ রয়েছে। একটি পথ হল, আমরা আমাদের নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধির উপর ভরসা করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবো এবং তার উপর আমল করব। আর অন্য পথ হল, এ ব্যাপারে নিজেরা ফায়সালা করার পরিবর্তে পূর্ববর্তী কোন কুরআন হাদীস বিশারদের ইলমী প্রাজ্ঞতা, আমলী পূর্ণতা, তাকওয়া খোদাভীরুতার ভিত্তিতে তার উপর আস্থা রেখে তার ব্যাখ্যানুযায়ী আমল করবো। ইনসাফ ও বাস্তবতার সঙ্গে যিনি পরিচিত তিনি নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য হবেন, প্রথম পথটি ভয়ঙ্কর ও আত্মঘাতী আর দ্বিতীয়টি সতর্কতা ও পরহেযগারী। মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির কুরআন হাদীসের উপর আমল করার এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তাকলীদ নামে পরিচিত। তাকলীদের এ ধারা যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু হয়েছিল, এবং সাহাবাযুগেও চালু ছিল তার প্রমাণ আমরা ইতোপূর্বে পেশ করেছি। এবার তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের তাকলীদের কিছু প্রমাণ পেশ করা যাচ্ছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ. সহ অসংখ্য তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈন যারা কুরআন হাদীসের জ্ঞানে পূর্ণমাত্রায় দক্ষ-বিজ্ঞ ছিলেন। কুরআন হাদীসের বাণী থেকে মূলনীতি তৈরি করে তার আলোকে মাসআলা মাসাইল বের করা ছিল যাদের নিকট পানি পানের মতই সহজ ব্যাপার এবং যারা اصول ও فروع সর্বক্ষেত্রেই মুজতাহিদ ছিলেন তারাও বহু মাসআলায় পূর্বসূরীদের তাকলীদ করেছেন। অর্থাৎ যে সকল মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে তারা প্রথমেই কিয়াস করার পরিবর্তে সাহাবাদের কথা ও কাজ খোঁজ করতেন। আলোচ্য বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোন বাণী বা কর্মের সন্ধান পেলে তারা তার তাকলীদ করতেন। যেমনঃ

১. হযরত উমর রা. কাজী শুরাইহ রহ. কে যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে এ-ও লেখা ছিল যে, যদি এমন কোন মাসআলার সম্মুখীন হও, যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহে (সরাসরি) নেই তাহলে পূর্ববর্তীদের ফায়সালার উপর আমল করবে। (দারেমী : ১/৪৬)

উল্লেখ্য কাজী শুরাইহ রহ. স্বয়ং মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন। তা সত্ত্বেও হযরত উমর রা. তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেবল পূর্ববর্তীদের মতামতের অবর্তমানে নিজের মতানুযায়ী ফায়সালার পরামর্শ দিয়েছেন।

২. ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় কিতাবে- واجعلنا للمتقين اماما

এর ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন- ائمة نقتدى لمن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন ইমাম বানান যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের ইকতিদা-অনুসরণ করতে পারি আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদেরকে অনুসরণ করতে পারে। (হাদীস নং ৭২৭৫ এর বাব দৃষ্টব্য)

৩. সুনানে দারেমীতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইমাম শাবী রহ. এর নিকট কোন ব্যাপারে জানতে চাইল। তিনি তাকে বললেন, ইবনে মাসউদ রা. এ ব্যাপারে এই কথা বলেছেন। লোকটি বলল, আপনি আমাকে আপনার মতামত বলুন। ইমাম শা‘বী রহ. উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা এই ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্যবোধ করছেন না? আমি তাকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ফাতাওয়া শোনালাম, আর সে আমার মতামত জানতে চায়! শুনে রাখুন, আমার কাছে এই ব্যক্তির চাহিদা পূর্ণ করার চেয়ে আমার দ্বীন অধিক মূল্যবান। আল্লাহর শপথ! আমার নিকট আমার মতকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মোকাবিলায় দাঁড় করানোর চেয়ে গান গেয়ে বেড়ানো উত্তম। (সুনানে দারেমী ১/৩৭)

লক্ষ্যণীয় হল, ইমাম শাবী রহ. নিজে মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন এবং ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর উস্তাদ ছিলেন তথাপি নিজের মতের মুকাবিলায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর তাকলীদ করাকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন এবং বিষয়টিকে দ্বীনের মূল্যায়ন ও অবমূল্যায়নের সঙ্গে তুলনা করলেন।

৪. বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রহ. বলেন,

اذا اختلف الناس في شيئ فانظروا ماصنع عمر فخذوابه.

অর্থঃ কোন বিষয়ে যখন লোকেরা মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে তখন লক্ষ্য করো এ ব্যাপারে হযরত উমর রা. কি বলেছেন, অতঃপর সেটাকে গ্রহণ করো। (ই‘লামুল মুআক্কিয়ীন:১/১৬)

www.muslimdm.com

৫. হযরত আ'মাশ রহ. ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর ব্যাপারে বলেন, যখন কোন মাসআলায় হযরত উমর রা. ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. একমত পোষণ করেন তখন ইবরাহীম নাখায়ী রহ. আর কারও কথাকে তাদের সমান মনে করেন না। আর যখন তাদের দুজনের মধ্যে দ্বিমত হয় তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর কথাকে গ্রহণ করেন। দেখা যাচ্ছে ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বিভিন্ন মাসআলায় তাঁদের তাকলীদ করতেন। (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন:১/১৭)

৬. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. বলেন, ইয়ামানের মুআয ইবনে জাবাল রা. আমাদের নিকট আগমন করলেন। তিনি আমাদের আমীর ও শিক্ষক ছিলেন। আমরা তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম যে, এক ব্যক্তি তার মেয়ে, বোন রেখে ইন্তেকাল করেছে এখন তাঁদের মধ্যে মীরাস কিভাবে বণ্টিত হবে? হযরত মুআয মেয়েকে অর্ধেক আর বোনকে অর্ধেক মীরাস বণ্টন করলেন।

দেখার বিষয় হল, হযরত মুআয রা. মুফতী হিসেবে ফাতাওয়া দিলেন কিন্তু তার দলীল বর্ণনা করলেন না। আর ইয়ামানবাসীও বিনা বাক্যে বিনা দলীলে তার ফায়সালা মেনে নিলেন। তাকলীদ তো একেই বলে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৭৩৪)

৭. ইমাম শা'বী রহ. বলেন-

من سره ان ياخذ بالوثيقة في القضاء فلياخذ بقول عمر رضـــ

'যে ব্যক্তি বিচারকার্য বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কথা গ্রহণ করতে চায় সে যেন হযরত উমর রা. এর কথাকে গ্রহণ করে।' (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন:১/১৬)

এখানে হযরত শাবী রহ. বিচারকার্য বিষয়ে হযরত উমর রা. এর তাকলীদ করতে বললেন। সুনান ও আসারের কিতাবসমূহে তাকলীদ বিষয়ক তাবেঈদের আরও অগণিত বর্ণনা রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় যৎসামান্য উল্লেখ করা হল। তাকলীদ খাইরুল কুরুনের স্বর্ণযুগেই বিদ্যমান ছিল, একথা আমরা বিভিন্ন দলীল প্রমাণাদির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। তবে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ করা তখনও পর্যন্ত জরুরী হয়নি। বরং অনির্দিষ্টভাবে যখন যার নিকট জিজ্ঞেস করা বা যাকে মেনে চলা সম্ভব ও সহজ হতো জনসাধারণের মধ্যে তার কাছ থেকেই জিজ্ঞেস করা ও তার মতানুযায়ী আমল করার বেশি প্রচলন ছিল।

এর দুটি কারণ ছিল:

ক. শরী'আতের খুঁটিনাটি সকল বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক মাযহাবের যাবতীয় উসূল ও নীতিমালা তখনও পর্যন্ত লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়ে মুসলমানদের হাতে পৌঁছেনি। বিধায় যাবতীয় মাসআলা মাসাইলে একজন ইমামের তাকলীদ করা তখন কষ্টসাধ্য বরং দুষ্কর ছিল।

খ. সর্বসাধারণের মধ্যে দ্বীন-ধর্ম, তাকওয়া-পরহেযগারী পূর্ণনিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যমান ছিল। অর্থহীন আবেগ, কুপ্রবৃত্তি ও সুবিধাবাদের প্রতি তাদের মোটেও আকর্ষণ ছিল

www.muslimdm.com

না। এজন্য সে যুগে নিজের সুবিধামত পদ্ধতির অনুকূল মতামত খুঁজে খুঁজে গ্রহণ করতে দ্বীন-ধর্ম নিয়ে খেলাধুলায় মেতে ওঠার আশঙ্কা ছিল নেহায়েত কম। ফলে প্রায় দু'শ হিজরী পর্যন্ত অমুজতাহিদের জন্য মাযহাবসমূহের মধ্য থেকে বা ইমামগণের মধ্যে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে তার অনুসরণ করাকে উলামায়ে কেরাম জরুরী মনে করেননি। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ অথবা তৃতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে উপর্যুক্ত কারণ দুটি বিলুপ্ত হতে থাকলে তাকলীদে শাখছি বা নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। কারণ তখন থেকে মুজতাহিদ ইমামদের শিষ্যগণ আপন আপন উস্তাদ ও তার মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী শরী'আতের সকল শাখার যাবতীয় সমস্যার সমাধান লিখিত ও পুস্তক আকারে সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে শুরু করেন।

দ্বিতীয়তঃ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো, অন্যায় আবেগ ও সুবিধাবাদের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সাধারণ তাকলীদ অর্থাৎ নিজ নিজ রুচি ও বিবেচনা অনুযায়ী যখন যাকে ইচ্ছা সুযোগমত জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করার পদ্ধতি দিন দিন বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হতে থাকে। তাই মানুষের বিবেক-বিবেচনা, খোদাভীতি ও তাকওয়ার অবনতিকালীন সেই নাযুক সময়ে যদি তাকলীদে মুতলাক অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদের পথ খোলা থাকে, তাহলে অনেকে জেনে-বুঝে স্বজ্ঞানে আবার কেউ কেউ না জেনে না বুঝে দ্বীনের পরিবর্তে কুপ্রবৃত্তির তাকলীদ করে বেড়াবে। যেমন শীতকালে কোন ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়ল। তো ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে এই ব্যক্তির উযু ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে উযু ভাঙ্গেনি, এখন ওই ব্যক্তি শীতের মধ্যে উযু করার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসরণ করে বলবে আমার উযু বহাল আছে। এর কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তি যদি কোন গায়রে মাহরাম মহিলাকে পর্দা বিহীন স্পর্শ করে তাহলে ইমাম শাফেয়ী রহ. মতে তার উযু ভেঙ্গে গেছে আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে উযু ঠিক আছে। তখন সে ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতের অনুসরণ করে বলবে, আমার উযু আছে। এ অবস্থায় সে নামাযও পড়বে। আর খাহেশাতের পূজারী হয়ে দ্বীন থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে। উদাহরণত: উক্ত মাসআলায় সে একই সময় দুই ইমামের অনুসরণ করে উযু বহাল থাকার দাবী করে নামায পড়ে নিল। এখন যদি উভয় ইমামের নিকট তার নামায সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া চাওয়া হয়, উভয় ইমামই তার নামায না হওয়ার ফাতাওয়া দিবেন। তারা এর কারণ হিসেবে বলবেন যে, সে উযু ছাড়াই নামায পড়েছে। তবে উযু না থাকার কারণ দুজনের দু'রকম বলবেন, সেটা ভিন্ন কথা।

বলাবাহুল্য, এ কাজের ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, শরী'আতের বিধি-বিধান মানুষের অবৈধ চাহিদার অনুগামী হয়ে খেলনায় পরিণত হবে। এ জাতীয় খামখেয়ালীপনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই। এরই

www.muslimdm.com

প্রেক্ষিতে দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী ফুকাহায়ে কেরাম যখন দেখলেন, মানুষের দ্বীনদারীর পরিমাপক পারদ দিনকে দিন নিচে নেমে যাচ্ছে এবং তারা ধীরে ধীরে প্রবৃত্তির দাস হয়ে ওঠছে তখন দ্বীনী ব্যবস্থাপনা অক্ষুন্ন্য ও অটুট রাখার স্বার্থে তাঁরা একমত হয়ে ফাতাওয়া দিলেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং তাকলীদে মুতলাক তথা অনির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করার এখন আর কোনো সুযোগ অবশিষ্ট নেই। ফুকাহায়ে কেরামের এই ঐক্যবদ্ধ ফাতাওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর খেলাফ করা ফাসেকী কাজ এবং স্পষ্ট গোমরাহী। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাফরমানী এবং মুমিনদের রাস্তা পরিত্যাগ করার শামিল। এ কাজকে কে কুরআনে কারীমে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে জাহান্নামের রাস্তা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতার ৪/১৫৩, আল আশবাহ ১৬৯ পৃষ্ঠা, আশরাফিয়া লাইব্রেরী)

চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মত ইমাম মেনে দ্বীনের উপর আমল করছে

শীআ সম্প্রদায় ও কিছু লা মাযহাবী ব্যতিত মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষ ফুকাহায়ে কেরামের সেই ঐক্যবদ্ধ ফাতাওয়ার পর থেকে মিল মুহাব্বতের সাথে কোন না কোন ইমামের ফায়সালার উপর আমল করে আসছেন। কখনো এ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়নি। এ বিষয়ে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ব্রিটিশ আমলে আহলে হাদীস নামক দলের আবির্ভাবের মাধ্যমে। আহলে হাদীসদের প্রসিদ্ধ আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান স্বীয় গ্রন্থ তরজুমানে ওয়াহাবিয়্যাতে লিখেন,

خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ---اس وقت سے لیکر آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل اور مفتی حاکم ہوتے رہے ہیں۔

অর্থঃ হিন্দুস্থানের মুসলমানদের অবস্থা হল এ দেশে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সবাই হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আর আলেম, ফাযেল, মুফতী, বিচারক সবাই এক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (তরজুমানে ওয়াহাবিয়্যাত)

তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য এমন কোন কিতাব পাওয়া যাবে না যে, উক্ত কিতাবের লেখক কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। এমনকি গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা যাকে ইমাম মানেন এবং যাকে তারা লা মাযহাবী বলে দাবী করেন সেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.ও মূলত হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার রচিত ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত কিতাব মাজমুআতুল ফাতাওয়া এরই প্রমাণ বহন করে। লা মাযহাবীদের অন্যতম ইমাম

www.muslimdm.com

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. কে হাম্বলী মাযহাবের বলে উল্লেখ করেছেন।

অনরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী রহ.কেও তারা লা মাযহাবী বলে দাবী করে। অথচ তিনি স্বীয় মাযহাব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

واما مذهبنا فمذهب الامام احمدبن حنبل امام اهل السنة في الفروع ولاندعى الاجتهاد.

অর্থঃ আমাদের মাযহাব হল, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব। যিনি শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম। আর আমরা মুজতাহিদের দাবীদার নই। (আল হাদিয়াতুস সুন্নিয়্যাহ পৃ: ৯৯)

সারকথা, ইসলামের শুরু থেকে উম্মতের অমুজতাহিদ ব্যক্তিগণ মুজতাহিদদের অনুসরণ করে আসছেন। যদিও হিজরী ৩য় শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কোন মুজতাহিদদের অনুসরণ বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে তৃতীয় শতাব্দী থেকে চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে যায়। যার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত উম্মতের সকলেই চার মাযহাবের কোন একটি মেনে দ্বীনের উপর আমল করে আসছে। এটাই উম্মতের ইজমা আর এটিই সিরাতে মুস্তাকীম।

যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরীনে কেরাম সকলেই মাযহাবপন্থী ছিলেন

পূর্বোক্ত আলোচনা ও গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান সাহেবের স্বীকারোক্তির পর একথা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, ইসলামে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সর্বযুগেই উম্মতে মুসলিমা কোন না কোন মুজতাহিদ ও স্বীকৃত মাযহাব অনুসরণ করে দ্বীন ধর্ম পালণ করে আসছে। তথাপি আত্মপ্রশান্তির জন্য পাঠকের খিদমতে কুরআনের ধারক-বাহক মুফাসসিরীনে কেরামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল। যারা স্ব-স্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির ও কুরআন বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন না কোন একটির মুকাল্লিদ ছিলেন।

www.muslimdm.com

নং	নাম	মৃত্যুসন (হিজরী)	কিতাব	মাযহাব
১.	ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী আল জাসসাস	৩৭০	আহকামুল কুরআন (তাফসীরুল জাসসাস)	হানাফী
২.	নসর ইবনে মুহাম্মাদ	৩৭৩	তাফসীরে সমরকন্দী	হানাফী
৩.	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ	৭০১	তাফসীরে নাসাফী	হানাফী
৪.	মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুস্তাফা	৯৫২	তাফসীরে আবিস সউদ	হানাফী
৫.	কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি	১২২৫	তাফসীরে মাযহারী	হানাফী
৬.	ইসমাইল হাক্কী	১১২৭	রুহুল বয়ান	হানাফী
৭.	শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলূসী	১২৭০	রুহুল মাআনী	হানাফী
৮.	মাওলানা আশরাফ আলী থানভী	১৩৬২	বয়ানুল কুরআন	হানাফী
৯.	মুফতী মুহাম্মাদ শফী দেওবন্দী	১৩৯৬	মাআরিফুল কুরআন	হানাফী
১০.	মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী	১৩৯৪	মাআরিফুল কুরআন	হানাফী
১১.	আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত তাবারী	৫০৪	তাফসীরে তাবারী	শাফেয়ী
১২.	হুসাইন ইবনে মাসউদ বগবী	৫১০	তাফসীরে বগবী	শাফেয়ী
১৩.	মুহাম্মাদ ইবনে উমর (ইমাম রাযী)	৬০৬	তাফসীরে কাবীর	শাফেয়ী
১৪.	আব্দুল্লাহ ইবনে বাইযাবী	৬৮৫	তাফসীরে বাইযাবী	শাফেয়ী
১৫.	আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ	৭৪১	তাফসীরে খাযেন	শাফেয়ী
১৬.	ইসমাইল ইবনে আমর আদদিমাশকী	৭৭৪	তাফসীরে ইবনে কাসীর	শাফেয়ী
১৭.	জালালুদ্দীন মহল্লী	৮৬৪	তাফসীরে জালালাইন	শাফেয়ী
১৮.	জালালুদ্দীন সুয়ূতী	৯১১	জালালাইন ও আদদুররুল মানসূর	শাফেয়ী
১৯.	মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ শিরবীনি	৯৭৭	তাফসীরে খাতীব	শাফেয়ী
২০.	মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আন্দালুসী	৫৪৩	আহকামুল কুরআন	মালেকী
২১.	আব্দুল হক ইবনে গালেব	৫৪৬	তাফসীরে ইবনুল আতিয়্যা	মালেকী
২২.	আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আস সাআলাবী	৮৭৬	আল জাওয়াহিরুল হিসান	মালেকী
২৩.	মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী	৬৭১	তাফসীরে কুরতুবী	মালেকী
২৪.	মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আন্দালুসী	৭৪৫	আল বাহরুল মুহীত (তাফসীরে আবী হাইয়ান)	মালেকী
২৫.	ইবনে আদেল আবী হাফস	৮৮০ এর পরে	তাফসীরুল লুবাব ফী উলুমীল কুরআন	হাম্বলী
২৬.	ইবনে রজব	৭৯৫	তাহকীকু তাফসীরিল ফাতিহা	হাম্বলী

www.muslimdm.com

বড় বড় হাদীস বিশারদগণ নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতেন

শুধু মুফাসসিরীনে কেরামই নন বরং মুহাদ্দিসীনে কেরাম যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী, মুজাহাদার বদৌলতে হাদীসে নববীর সুবিশাল ভাণ্ডার আজও পর্যন্ত অবিকলভাবে বিদ্যমান তাঁরাও কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করে চলতেন।

তাঁরা কেউ নিজের লেখা হাদীসের কিতাব অনুযায়ী চলেননি বা কাউকে মাযহাব বাদ দিয়ে তাঁদের কিতাব অনুযায়ী চলতে বলেননি।

উদাহরণতঃ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।(আত তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ ১/৪২৫-৪২৬)

তাহাবী শরীফ প্রণেতা ইমাম তাহাবী রহ. হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী রহ. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (মাআরেফুস সুনান ১/৮২-৮৩)

কী আশ্চর্য! এত বড় বড় হাদীস বিশারদগণও নিজ নিজ কিতাবের উপর আমল না করে চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণ করেছেন। এমন কি উপর্যুক্ত কোন একজন মুহাদ্দিসও নিজ নিজ কিতাবের ভূমিকায় একথা বলেননি যে, তোমরা আমার এই কিতাব পড়ে পড়ে দ্বীন পালন করবে। বরং তাঁরা দ্বীন পালনের উদ্দেশ্যে মাসআলা মাসাইল ও ফাতাওয়া জানার জন্য লোকদেরকে মাযহাবের ইমামদের শরণাপন্ন হতে বলতেন।

উদাহরণতঃ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ. তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, যুহাইর ইবনে হারব ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসীনদের নিয়ে এক মজলিসে বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে কোন ব্যাপারে তাকে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমাদের নিকট কেন এসেছো, কোন ইলমওয়ালার নিকট যাও। উপস্থিত শাগরেদদের মধ্যে আলী ইবনুল মাদীনী প্রশ্ন করলেন, জনাব! আপনার নিকট উপস্থিত এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ কি আহলে ইলম নন? তিনি উত্তর দিলেন, না, আহলে ইলম তো ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার শাগরেদগণ। (ইরশাদুল ক্বারী ৩২) অর্থাৎ ফিকাহবিদগণ প্রকৃত আহলে ইলম। এ কথাটি ইমাম তিরমিযী রহ.ও তার জামে তিরমিযী হাদীস নং ৯৯০ এর শেষে উল্লেখ করেছেন। নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি আস্থাশীল বন্ধুগণ এ ঘটনা নিজেদের থেকে কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

যা হোক, বলা হচ্ছিল, মুহাদ্দিসীনে কেরামও কোন না কোন মাযহাব অনুসরণ করে চলতেন। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, কেন? কেন তারা নিজেরা মুজতাহিদ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ হাদীসের কিতাবের উপর আমল না করে মাযহাবের অনুসরণ করতেন?

এর উত্তর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কুতুবে সিত্তাহর দরস প্রচলনকারী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। ফুয়ুযুল হারামাইন গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, আমার খেয়াল ছিল, আল্লাহ তা‘আলা

আমাকে কুরআন হাদীসের যে ইলম দান করেছেন তার আলোকে (কোনো মাযহাবের তাকলীদ না করে) নিজে নিজেই মাসআলা বের করে চলতে থাকি। কিংবা আমি যাঁদের নিকট হাদীসের কিতাব পড়ে এসেছি যাঁরা শাফেয়ী অথবা মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁদের মাযহাব অনুসরণ করি। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমে আমাকে হানাফী মাযহাব মানতে বাধ্য করা হয়েছে যে, হে শাহ ওয়ালীউল্লাহ! ভারতবর্ষের সাধারণ মুসলমানগণ সকলেই হানাফী, কাজেই এখানে তোমাকে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। দেখুন, এত অগাধ ইলম ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিকে পর্যন্ত নিজ ইলম অনুযায়ী চলার অনুমতি দেয়া হয়নি। এমনকি শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মানারও এজাযত দেয়া হয়নি। কারণ এ অঞ্চলের মুসলমানগণ হানাফী হওয়ায় তিনি যদি অন্য মাযহাব গ্রহণ করতেন তাহলে তার ইলম দ্বারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের কোনো উপকার হতো না।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাযহাব অনুসরণের আরেকটি কারণ এ-ও যে, যুগ ও সময়ের বিবেচনায় তাঁরা ছিলেন মাযহাবের ইমামগণ বিশেষত: ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর শিষ্য কিংবা শিষ্যের শিষ্য পর্যায়ের। ফলে একদিকে ইমামুল মাযহাবগণের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সম্যক অবগত, অপরদিকে তাঁরা ইলম অর্জন করে হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলন করার বহু আগেই মুজতাহিদ ইমামগণ নিজেদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হাদীস ভাণ্ডার থেকে সারনির্যাস বের করে ফিকহ সংকলন করে রেখে গিয়েছিলেন। কাজেই একজন মুহাদ্দিসকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সর্বপ্রথম মাযহাবের ইমাম সংকলিত ফিকহের আলোকে দ্বীনের অনুসরণ করে তারপর মুহাদ্দিস হতে হয়েছে। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ইমাম বুখারী রহ. সংকলিত সহীহ বুখারীর কোনো কোন বাব ও শিরোনাম যা ফিকহুল বুখারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের বিপরীত লক্ষ্য করা যায়। তাহলে কিভাবে তাকে শাফেয়ী বা মাযহাবপন্থী বলা যায়? এর জবাব হল, মাযহাবপন্থী হওয়ার পাশাপাশি তিনি নিজেও মুজতাহিদে মুতলাক পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কাজেই ক্ষেত্র বিশেষে দলীলের ভিত্তিতে ইমামুল মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করায় তাকে লা মাযহাবী বলে প্রচার করার সুযোগ নেই। যেমন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সুযোগ্য শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কোন কোন মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এ জন্য তাঁরা কি ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী ছিলেন না? তবে এ কাজটি একমাত্র মুজতাহিদ পর্যায়ের লোকের জন্যই বৈধ, যে কোন আলেম এমনটি করতে পারবে না। করলে সে গোমরাহ সাব্যস্ত হবে। বলছিলাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর শিষ্য কিংবা শিষ্যের শিষ্য। এটা কোনো মৌখিক কাব্য নয়। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুনঃ

শাজারায়ে মুবারাকাহ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম - ওফাত: ১১ হিজরী

(শিষ্য) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. -মৃত্যু: ৩২ হিজরী

(শিষ্য) আলকামা রহ. মৃত্যু: ৬২ হিজরী

(শিষ্য) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. মৃত্যু: ৯৬ হিজরী

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান মৃত্যু: ১২০ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফা রহ. মৃত্যু : ১৫০ হিজরী

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মৃত্যু: ১৮৯ হিজরী

ইমাম শাফেয়ী রহ. মৃত্যু: ২০৪ হিজরী

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মৃত্যু: ২৪১ হিজরী

ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী

ইমাম মুসলিম রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ.

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর একেবারে নাতিপোতা পর্যায়ের শিষ্য বরং তিনি আরও একধাপ পরবর্তী স্তরের। আর ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী রহ. তো তাঁর চেয়েও নিচের ধাপের শিষ্য। সুতরাং তারা মাযহাব মেনেই বড় হয়েছেন, মুহাদ্দিস হয়েছেন এবং কেউ তাঁদের কিতাবের মধ্যে মাযহাব মানার বিরুদ্ধে কোন শ্লোগান দেননি। আল্লাহ মাফ করুন, উপরোক্ত আলোচনা ও চিত্র প্রদর্শন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কষ্মিনকালেও মুহাদ্দিসীনে কেরামের (আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের দারাজাতকে আরও বুলন্দ করে দিন) মর্যাদা খাটো করা নয়। বরং এর দ্বারা নবীযুগের সঙ্গে ইমামুল মাযহাব ও ইমামুল মুহাদ্দিসীনের সংশ্লিষ্টতার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য। যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়গভীরে মাযহাবের ইমামদের সত্যিকার মর্যাদা পূর্ববৎ জাগরুক থাকে যা কতিপয় অপরিণামদর্শী লা মাযহাবী বন্ধুদের চেঁচামেচিতে সন্দেহের আবরণে ঢাকা পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। বস্তুত! আল্লাহ তা‘আলাই সত্যকে উন্মোচন করে দেন।

নির্দিষ্ট মাযহাব মানার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা ও ঐক্যমত

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শরী‘আতের মৌলিক ও স্পষ্ট বিধি-বিধান এবং আকীদাগত বিষয়ে কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রান্তিক ও শাখাগত অনেক মাসাইলের ক্ষেত্রে যেহেতু কুরআন হাদীসে বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়, আর দলীল প্রমাণের আলোকে বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ একাধিক আয়াত বা হাদীসকে সামনে রেখে আমলযোগ্য সিদ্ধান্তটি খুঁজে বের করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, এ জন্য সে সকল বিষয়ে আমল করতে গিয়ে কোন মুজতাহিদ ইমামের মতামত তথা মাযহাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা

দেখা দেয়। মাযহাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং শরী'আতের পক্ষ থেকে তার অনুমোদনের বৈধতা বরং জরুরী হওয়ার বিষয়টি আমরা পূর্বের দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি। এখন যে বিষয়টি জানা দরকার তা হল, উলামা ও ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমতের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত যে, বর্তমানে চার ইমামের মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব গ্রহণ করা বৈধ নয়। সুতরাং চার ইমামের মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি তা তিনি যত বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্নই হোন না কেন তার মাযহাব গ্রহণ করা ইজমায়ে উম্মত অর্থাৎ উম্মতের সর্ববাদী সিদ্ধান্তের খেলাফ হবে যা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয নয়।

এ বিষয়ক কিছু উক্তি পেশ করা হচ্ছেঃ

১. গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের মান্যবর ইমাম, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. (মৃত্যু:৭২৮ হি.) চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মুজতাহিদের মাযহাব মানা যাবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, الاجماع اليوم قدانعقد على خلاف هذا القول.

অর্থঃ এর বিপরীতে (চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মুজতাহিদের মাযহাব না মানার ব্যাপারে) আজ ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ২০/৫৮৪)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল, উম্মতের ঐক্যমতে বর্তমানে চার ইমামের মাযহাবই অনুসরণযোগ্য।

২. প্রখ্যাত হাদীস গবেষক ও বিশ্লেষক ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু:৭৪৮হি.) বলেন, فيمتنع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت تحررت.

অর্থঃ মাসআলা মাসাইল সংক্রান্ত ফাতাওয়া ও আদালতের ফায়সালার ক্ষেত্রে চার ইমাম ব্যতীত অন্য কারো তাকলীদ ও অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা এই চার মাযহাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা কিতাবাকারে সংকলিত হয়েছে। (ফয়যুল কাদীর ১/২৬৯ ও ২৮৮)

৩. ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. (মৃত্যু: ৮০৮ হি.) তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ তারীখে ইবনে খালদুনে লিখেছেনঃ

وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هولاء الائمة الاربعة.

অর্থঃ এ যুগে ইসলামের অনুসারীগণ এই চার ইমামের একজনকে তাকলীদ (অনুসরণ) এর জন্য বরণ করে নিয়েছেন। (তারীখে ইবনে খালদুন ১/৪৭৯)

৪. বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু: ৯৭০ হি.) বলেন,

وماخالف الائمة الاربعة فهو مخالف للاجماع.

অর্থঃ যে মাযহাব ও মতামত ইমাম চতুষ্টয়ের বিপরীত হবে তা মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা সর্ববাদী সিদ্ধান্তের বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হবে। (আল আশবাহ-১৬৯)

৫. ভারতবর্ষের বিখ্যাত ফকীহ ও ফিকহের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ শায়খ আহমদ মোল্লা জিয়ুন রহ. স্বীয় গ্রন্থ তাফসীরে আহমাদিয়াতে লিখেনঃ

قد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربع ...وكذا لايجوز لاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم.

অর্থঃ কেবল ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদই বৈধ হবে, এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ এদের বিপরীতে কোন নব্য মুজতাহিদের অনুসরণ বৈধ হবে না। (তাফসীরে আহমাদিয়্যা পৃ: ৩৪৬)

৬. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (মৃত্যু: ১১৭৬ হি.) বলেন,

ان المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة اومن يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا.

অর্থঃ সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণের বৈধতার উপর আজও পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ অর্থাৎ উম্মাহর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/২৮৬)

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা জানা গেল, বর্তমানে দ্বীন মানতে হলে উম্মতকে চার মাযহাবের কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে। এর বাইরে কোনো মাযহাব মানা হলে তা হবে ইজমার পরিপন্থী; অবৈধ ও নাজায়িয এবং স্পষ্ট গোমরাহী। প্রশ্ন হল চার ইমামের মাযহাবই যখন সহীহ ও অনুসরণযোগ্য তাহলে সকল বিষয়ে চারজনের একজনকে কেন মানতে হবে? যে বিষয়ে যখন যাকে খুশী তাকে অনুসরণ করা কেন বৈধ হবে না?

বন্ধুগণ! সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন একই সঙ্গে সকল ইমামের তাকলীদ বৈধ হবে না বা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের অনুসরণ বৈধ হবে না এ ব্যাপারে তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তার সঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন যে, মাযহাবসমূহ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে যেমন চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি অনুসরণের ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তির জন্য চার মাযহাবের মধ্যে থেকে কেবল যে কোন একটিকে গ্রহণ করা বৈধ ও একাধিক মাযহাব গ্রহণ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারেও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক মাযহাব মানা বাস্তবতার নিরিখেই যেমন অসম্ভব তেমনি মনের চাহিদা অনুযায়ী যখন যে মাযহাব মনে চায় অনুসরণ করাও বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির খেলাফ। কেননা শয়তানের সহযোগী নফসে আম্মারা তথা কুপ্রবৃত্তির অধিকারী মানুষের জন্য তা হবে প্রবৃত্তিপূজার হাতিয়ার। বিষয়টি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

১. গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لايجوز باتفاق الائمة ونظير هذا ان يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشتريا فان هذا لايجوز بالاجماع...لان ذالك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الاهواء.

অর্থঃ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হলে তারা সেই ইমামের অনুসরণ করে যিনি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিষয়টি নাজায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। আবার স্বার্থের বিপরীত হলে সেই একই ব্যক্তিবর্গ এমন ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিষয়টি জায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। প্রবৃত্তির এমন লাগামহীন গোলামী সকল ইমামের মতেই নাজায়িয ও অবৈধ। এ জাতীয় বিষয়ের একটি উদাহরণ হল, নিজে প্রতিবেশী ও দাবীদার হলে প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে 'ক্রয়ে অগ্রগন্যতার হক' বৈধ বলা আর নিজে ক্রেতা হলে প্রতিবেশীর জন্য তা অবৈধ বলা। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি বিষয়ে স্বার্থের অনুকূল মাযহাব অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ইজমা তথা সকলের ঐক্যমতে বৈধ নয়। কারণ এটা দ্বীন নিয়ে খেলতামাশার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী হারাম-হালাল নির্দিষ্ট করণের পথ খুলে দেয়। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ৩২/১০০-১০১)

২. বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী তকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) নির্দিষ্ট এক ইমাম মানার ব্যাপার উম্মতের ঐক্যমতের কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

فلو ابيح لكل احد ان ينتقى من هذه الاقوال ماشاء متى شاء لادى ذلك الى اتباع الهوى دون الشريعة الغراء وبالتالي فان كل واحد من هذه المذاهب له نظام خاص يعمل في اطاره بحيث ان كثيرا من مسائله مرتبط بعضها ببعض فلو اخذ منه حكما وترك حكما اخر يرتبط به لاختل ذالك النظام وحدثت حاله من التلفيق لايقول بصحتها احد...ومن هنا دعت الحاجة الى التمذهب بمذهب معين.

অর্থঃ মনের অনুকূলে স্বাধীন মত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলে প্রবৃত্তির অনুসরণের পথই কেবল উন্মুক্ত হবে, নিখাঁদ শরী'আতের অনুসরণ হবে না।...

দ্বিতীয়তঃ মাযহাবগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, আমলের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা যার ভিত্তিতে সেখানে আমল করা হয়। ফলে দেখা যায় অনেক মাসআলাই একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং যদি কোন একটি বিধানকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপর বিধানকে বর্জন করা হয় তাহলে মাযহাবের মূলনীতি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে এবং প্রবৃত্তি অনুসরণের পথ সৃষ্টি হবে

যাকে পরিভাষায় তালফীক বলা হয়। যা বৈধ হওয়ার কথা কেউ আদৌ বলেন না।...আর এ কারণেই নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। (উসূলুল ইফতা পৃ: ৬৩-৬৪)

৩. বিখ্যাত গ্রন্থ রিয়াজুস সালেহীন প্রণেতা আল্লামা নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.) বলেন,

انه لو جاز اتباع اى مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذالك يؤدى الى انحلال ربقة التكليف..فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين.

অর্থঃ মনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কোন মাযহাবের অনুসরণ বৈধ হলে তা মানুষকে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মাযহাবসমূহের সহজ সুবিধাজনক ও অনুকূল বিষয়গুলো লুটে নেয়া এবং হারাম-হালাল, ও আবশ্যকীয় ও বৈধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মনের পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকে ঠেলে দিবে। আর এই মনোভাব শরয়ী বাধ্যবাধকতার লাগাম অবমুক্ত করে দিবে। সুতরাং অনুসরণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নির্বাচনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। (আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব। ভূমিকা অংশ ১/১২০-১২১)

৪. হাফেজে হাদীস আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন,

وعلى غير المجتهد ان يقلد مذهبا معينا.

অর্থঃ গাইরে মুজতাহিদ অর্থাৎ কুরআন হাদীস ও শরী'আতের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও সল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব অনুসরণ করে আমল করা অপরিহার্য। (ফয়যুল কাদীর ১/২৬৯)

৫. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

اعلم ان الناس كانوا في المائة الاولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم ...وعلى هذا ينبغي ان القياس وجوب التقليد لامام بعينه.

অর্থঃ মুসলমানগণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকে নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না অর্থাৎ তখন পর্যন্ত এর প্রয়োজন দেখা দেই নি। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের পর নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবসমূহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।...সুতরাং নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া বুদ্ধি-বিবেচনারই দাবী। (আল ইনসাফ পৃ: ৬৮-৭০)

উপরোক্ত পাঁচটি বক্তব্যের প্রথম দুটি নির্দিষ্ট করে যে কোন একজন ইমামের মাযহাব অনুসরণের বাস্তবতা ও এ সংক্রান্ত ইজমা তুলে ধরেছে আর পরবর্তী

বক্তব্যগুলো এটাকে আরও জোরদার করে তুলেছে। সুতরাং বর্তমানে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণের বিকল্প নেই।

কুরআন-হাদীসের আলোকে ইজমা অস্বীকার ও অমান্যকারীর অশুভ পরিণতি

ইজমা তথা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বিজ্ঞ উলামাদের ঐক্যমত শরী‘আতের দলীল হওয়ার বিষয়টি প্রবন্ধের শুরুর দিকে কুরআন-হাদীসের বাণী, সাহাবায়ে কেরামের মন্তব্য ও বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্যের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারপর উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, সঠিক পন্থায় দ্বীন-ধর্ম পালনের জন্য চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব অর্থাৎ অত্যাবশ্যক হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা ও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষ যদি উম্মতের ইজমার বিরোধিতা, অস্বীকার কিংবা অবজ্ঞা করে তাহলে এর পরিণতি কী হবে তা জানা দরকার, যেন এর অশুভ পরিণতি থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء: ١١٥]

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি রাসুলের বিরোধিতা করবে, তার নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে তাহলে সে যা কিছু করে আমি তাকে করতে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা হচ্ছে নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান। (সুরা আন নিসা, আয়াত ১১৫)

নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে আয়াতে কারীমার তাফসীর তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। বিশিষ্ট মুফাস্সির শায়খ ওয়াহবা আয যুহাইলী রহ. তাফসীরে করতুবীর বরাতে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরুল মুনীরে লিখেনঃ

قال العلماء وعلى رأسهم الامام الشافعي رح في قوله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ...... دليل على صحة القول بالاجماع اى اتفاق المجتهدين من امة محمد صلعم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي لأنه تعالى قرن اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مباينة الرسول فيما ذكر له من الوعيد فدل على صحة اجماع الامة لالحاقه الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين.

অর্থঃ উলামায়ে কেরাম [ইমাম শাফেয়ী রহ. যাদের শীর্ষস্থানীয়] আল্লাহ্ তা’আলার বাণী ومن يشاقق الرسول إلخ সম্পর্কে বলেছেন, আয়াতটি ইজমা অর্থাৎ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর কোন যুগে শরী‘আতের কোন বিধানের ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মুজতাহিদ ব্যক্তিবর্গের ঐক্যমতে পৌঁছা-শরী‘আতের দলীল হওয়ার প্রমাণ। কারণ আল্লাহ্ তা’আলা এখানে মুমিনদের বিপরীত পথ অবলম্বন করাকে রাসূলের

নির্দেশ পরিত্যাগের শাস্তির সঙ্গে একত্রে জুড়ে দিয়েছেন। কাজেই আয়াতটি উম্মতের ইজমা দলীল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। কেননা এখানে মুমিনদের বিপরীত পথ অবলম্বনকারীকে (এমন ভয়াবহ) শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। (যা কেবলমাত্র ফরজ নির্দেশ পরিত্যাগের বেলায়ই দেয়া হয়ে থাকে। (তাফসীরুল মুনীর- ৩/২৮১)

২। আয়াতে কারীমায় দুটি কাজকে মহা অপরাধ ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। **এক.**রাসূলের বিরোধিতা। স্পষ্ট যে, রাসূলের বিরোধিতা কুফর ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ। **দুই.**যে ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐক্যমতে পৌঁছেছে তা পরিত্যাগ করে বিপরীত অন্য কোন পথ অবলম্বন করা। এর দ্বারা জানা গেল, উম্মতের ইজমা তথা ঐক্যমত শরী'আতের দলীল। অর্থাৎ যেমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহর বিধি-নিষেধের উপর আমল করা অত্যাবশ্যক অনুরূপ যে ব্যাপারে উম্মতের সুযোগ্য আলেম সমাজের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে তার উপর আমল করাও ওয়াজিব। এর বিরোধিতা করা গর্হিত অপরাধ। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম- এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

يد الله على الجماعة من شذ شذ في النار

অর্থাৎ জামা'আতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যাবে তাকে পৃথক করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মা'আরিফুল কুরআন, মুফতী শফী রহ. ২/৫৪৭)

৩. তাফসীরে উসমানীতে বলা হয়েছেঃ 'আকাবিরে উলামা এই আয়াত থেকে এ মাসআলাও বের করেছেন যে, উম্মতের ইজমা ও ঐক্যমতের বিরোধিতা ও অস্বীকারকারী ব্যক্তি জাহান্নামী। অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মত মান্য করা ফরজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদের জামা'আতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার হাত বা সাহায্য রয়েছে। যে ব্যক্তি ভিন্ন পথ গ্রহণ করল সে জাহান্নামে পতিত হলো। (তাফসীরে উসমানী ১/৩১৫) আরও বিস্তারিত জানতে তাফসীরে কাশ্শাফ ১/৫৫৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৪৬০, তাফসীরে মাযহারী ২/৪৫৩।

এখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সতর্কবাণী লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন, من فارق الجماعة شبرا فقد خلع الله ربقة الاسلام من عنقه

অর্থঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামা'আত থেকে এক বিঘাত পরিমাণ (ও) পৃথক হলো সে ব্যক্তির গ্রিবা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের রজ্জুকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। (আবূ দাউদ শরীফ, হা-৪৭৫৮)

দেখুন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ., হাফেয যাহাবী রহ., আল্লামা ইবনে খালদুন রহ., শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ রহ. প্রমূখ বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও সংস্কারক ব্যক্তিবর্গ যেখানে চার ইমামের কোন একজনের মাযাহাব মানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন এবং কুরআন-হাদীসও ইজমা অমান্যকারীদের

প্রতি নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেখানে আমাদের কর্তব্য ও করণীয় একেবারে স্পষ্ট। কাজেই ইজমার বিপরীতে নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ বাদ দিয়ে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনার পুঁজি খাটিয়ে কুরআন-হাদীসের উপর আমল করতে যাওয়া এবং এ পথে মুক্তি অন্বেষণ করা কেবল ধ্বংস ও বরবাদীই ডেকে আনবে। হায়! আর কবে আমরা একরোখা মনোভাব ত্যাগ করে সত্যকে বুকে ধারণ করার সৎসাহস দেখাব! আল্লাহ্ তা'আলাই তাওফীকদাতা।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বঃ

অনুসৃত চার মাযাহাবের মান্যবর চার ইমামের প্রত্যেকেই কুরআন-হাদীস সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। তবে তুলনামূলক বিচারে ইমাম আবূ হনীফা রহ. ছিলেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠজন। ফিকহশাস্ত্র সংকলন ও এর প্রচার-প্রসারে তাঁর বিস্ময়কর অবদান সম্পর্কে ছিটেফোঁটা অবগতি থাকলেও ইনসাফপ্রিয় প্রতিটি মানুষ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অবদানের কথা আলোচনার পূর্বে আমরা ফিকহশাস্ত্র ও এর ক্রমবিকাশ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় শরী'আতের বিধানাবলীর মান নির্ণীত ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সামনে উযু করতেন। মুখে বলতেন না যে, এটা ফরজ, এটা ওয়াজিব আর এটা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে দেখে ঠিক সেভাবে উযু করতেন। নামাযের অবস্থাও ছিল তাই। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদির বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিতেন না বা নেয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তাঁরা যেভাবে রাসূল صلى الله عليه وسلم -কে নামায আদায় করতে দেখতেন হুবহু সেভাবেই নিজেরা নামায আদায় করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি কোন জাতিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের চেয়ে উত্তম দেখিনি। কিন্তু তাঁরা নবীজীর গোটা জীবনে 'তেরো'র অধিক মাসআলা জিজ্ঞেস করেননি। এর সবগুলোই আবার কুরআনে কারীমে বিদ্যমান। যে সমস্যাগুলো না জানলেই নয় সেগুলোই কেবল জিজ্ঞেস করতেন। (সুনানে দারেমী-মুকাদ্দিমা ১২৭)

অনেক সময় এমন হতো যে, কেউ কোন কাজ করেছে, তিনি সেটাকে ভালো বলেছেন অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এভাবে আদেশ নিষেধ সাধারণ সমাবেশে প্রকাশ পেত। আর সাহাবায়ে কেরাম সে পরিস্থিতিতে প্রদত্ত নবীজীর বক্তব্য স্মরণ রাখতেন। নবীজীর ইন্তেকালের পর ইসলামের বিজয় নিশান দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে সামাজিক জীবনের পরিধিও বর্ধিত হতে লাগল। সমস্যা এত বেশি ঘটতে লাগল যে, ইজতিহাদ ও মাসআলা আহরণের প্রয়োজন

www.muslimdm.com

দেখা দিল। এতে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিধি-নিষেধের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিতে হলো।

উদাহরণতঃ কেউ নামাযে ভুলক্রমে কোন আমল ছেড়ে দিল। এখন বিতর্ক এই দেখা দিল যে, তার নামায হলো কি হলো না, তো এর সমাধান কল্পে নামাযের কার্যাবলির সবগুলোকেই ফরজ বলে দেয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের কার্যাবলির মান নির্ণয় করে নিতে হয়েছে যে, এই এই কাজ ফরজ, ওয়াজিব আর এগুলো সুন্নাত বা মুস্তাহাব। বলাবাহুল্য আমলগুলোর মান নির্ণয়ের এ ইজতিহাদ ও গবেষণায় যে মূলনীতি অনুসরণ করা হতো, সে ব্যাপারে সকল সাহাবীর একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য মাসআলাসমূহে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং অধিকাংশ মাসআলায় সাহাবাদের মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এরূপ অনেক ঘটনারও উদ্ভব ঘটেছে, যেগুলোর মূল ছিল নবীযুগে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা। এরূপ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামকে মূল ঘটনার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার শাখা-প্রশাখা চিহ্নিত করে অতঃপর চলমান ঘটনাকে অনুরূপ ঘটনার সাথে সমন্বিত করে সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। এই যে বিশ্বস্ত ও বিশেষজ্ঞ গবেষক কর্তৃক যথাযোগ্য পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের ব্যবহারিক দিকটিকে উদ্ঘাটন ও আহরণ করা পরিভাষায় একে বলা হয় ইজতিহাদ। আর উদঘাটিত ও আহরিত মাসআলাকে বলা হয় ফিকহ। ফিকহ কুরআন-হাদীস বর্হিভুত কোনো বস্তু নয়; বরং কুরআন-হাদীসেরই ব্যবহারিক দিক।

ফিকহের আভিধানিক অর্থঃ

সূক্ষ্মদর্শিতা, উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞান। ফিকহে পারদর্শী ব্যক্তিকে বলা হয় ফকীহ। সুতরাং যখন বলা হয় ফিকহে হানাফী, ফিকহে মালেকী এর অর্থ হবে, কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক রহ.-এর সূক্ষ্মদর্শিতা, উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞান। সে মতে ফিকহুল কুরআন ও ফিকহুস সুন্নাহ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায় কুরআন-হাদীসের সূক্ষ্মদর্শিতা, উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞান। অথচ কুরআন ও হাদীস স্বশরীরী কোন সত্তা নয় যে, সে নিজেই নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানুষের সামনে পেশ করবে। বরং এ কাজের জন্য একজন সূক্ষ্মদর্শী ও গভীর জ্ঞানী মানুষ বিশ্লেষকের প্রয়োজন পড়বে। কাজেই আজকে যেসব ভদ্রলোক জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে ফিকহুল কুরআন ও ফিকহুস সুন্নাহ নামে বই পুস্তক রচনা করেছেন এবং সরলমনা মুসলিম জনসাধারণের মাঝে বিলি-বণ্টন করছেন, শুনতে যতই চটকদার মনে হোক, তা কিছুতেই ফিকহ নয় বরং ফিকহের নামে প্রতারণা মাত্র। কেননা ফিকহ আহরণের জন্য একজন স্বশরীরী ফকীহ আবশ্যক যা এখানে অনুপস্থিত। আর যদি এসব রচনা ও রটনাকে ফিকহ বলে মানতেই হয়, তাহলে এই ফিকহ হবে কুরআন-হাদীস সম্পর্কে স্বয়ং লেখক ও রচিয়তার ব্যক্তিগত সূক্ষ্মদর্শীতা ও গভীর জ্ঞান।

www.muslimdm.com

বলাবাহুল্য কুরআন-হাদীস সম্পর্কে নবীযুগের নিকটবর্তী খাইরুল করুনের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর জ্ঞান তথা, ফিকহ পরিত্যাগ করে চলমান চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও অবিশ্বস্ত যুগের কোন ফকীহ এর সূক্ষ্মদর্শীতার প্রতি আস্থাশীল হওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা কিছুতেই বিবেকসম্মত নয়।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, আজ আহলে হাদীস নামে পরিচিত বন্ধুরা চার হাত-পায়ে তাকলীদের বিরোধীতা করলেও ফিকহুল কুরআন ও ফিকহুস সুন্নাহ ঠিকই অনুসরণ করেন। বস্তুতঃ তারা নিজেদের অজান্তেই তাকলীদ করে যাচ্ছেন। তবে মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তির তাকলীদ আর এদের তাকলীদের পার্থক্য হচ্ছে, এরা পাহাড় সমান ইলম ও ব্যক্তিত্যের অধিকারী ইমাম চতুষ্টয়ের ফিকহ পরিত্যাগ করে এ যুগের ফকীহদের ফিকহ ও মাযহাবের তাকলীদ করছেন। দূরদর্শী কবি শেখ সাদী ঠিকই বলেছেন, “এরা ইউসুফ আ.-কে বিক্রি করে কোন ছাই ক্রয় করল।”

যা হোক, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে দ্বীনী সমস্যার সমাধান করেছেন এবং মুজতাহিদ ও ফকীহ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন, তাঁদের চারজন অত্যান্তপ্রসিদ্ধ ও পরিচিত। ১. হযরত উমর রা., ২. হযরত আলী রা., ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., ৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. অধিকাংশ সময় কুফা নগরীতে বসবাস করেছেন এজন্য এ শহরেই তাঁদের মাসআলা-মাসাইল প্রচলিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কুফা নগরীতে নিয়মিত হাদীস ও ফিকহের তা’লীম দিতেন। তাঁর শিক্ষালয়ে বহু ছাত্রের সমাগম হতো। তাঁর শাগরেদদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন আলকামা, আসওয়াদ, উবাইদা ও হারেস রহ.। হযরত আলকামা ও আসওয়াদের ইন্তেকালের পর ইবরাহীম নাখয়ী রহ. তাদের স্থলাভিসিক্ত হিসেবে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। হযরত ইবরাহীম নাখায়ীর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রিয় ছাত্র হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান তার মসনদ অলংকৃত করেন। ১২০ হিজরী সনে হাম্মাদের ইন্তেকালের কিছুদিন পর উলামাগণ ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে ফিকহের মসনদে সমাসিন করেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর যামানা পর্যন্ত যদিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফিকহের মাসআলা সংকলিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এ সংকলন ছিল প্রথমতঃ শুধু মৌখিক বর্ণনা। দ্বিতীয়তঃ তা স্বতন্ত্র বিদ্যা ও শাস্ত্র আকারে ছিল না।

ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবদানঃ

ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, মাগাযী ইত্যাদির শুরু ও সুচনা যদিও ইসলামের প্রারম্ভ থেকে হয়েছিল তবুও যত দিন পর্যন্ত সেগুলো একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেনি, তত দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম যুক্ত হয়নি। সে হিসেবে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত

ফিকহশাস্ত্রের সঙ্গেও কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম যুক্ত হয়নি। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনে সাবেত রহ.-এর সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিরলস চেষ্টা সাধনায় ফিকহশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে এবং একটি সতন্ত্র বিদ্যায় রূপ নেয়। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা রহ. ফিকহ আবিষ্কারক হিসেবে ভূষিত হন। ড. ফিলিপ হিট্টির ভাষায়ঃ

الاما م ابو حنيفة الذى وضع الاساس لاول مدارس شرع الاربع فى الاسلام.

অর্থঃ "আবূ হানীফা রহ. সেই ব্যক্তি, যিনি ইসলামে সর্বপ্রথম ফিকহ শরী'আর ভিত্তি স্থাপন করেন।"

অর্থাৎ আবূ হানীফা রহ. সহীহ হাদীসের আলোকে ইস্তিমবাত, ও গবেষণার মাধ্যমে ফিকহে ইসলামীকে এমন পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা দান করেন যে, তিনি ফিকহে ইসলামীর মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি যেমন ঘটিত বিষয়ে ফাতাওয়া ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি সম্ভাব্য ও ঘটিতব্য মাসআলার ফাতাওয়া ভাণ্ডারও গড়ে তুলেছিলেন। ফলে তার ফাতাওয়া ভাণ্ডার বিশাল আকার ধারণ করেছিল। আবূল ফজল কিরমানী তার ইরশাদুল মারাম গ্রন্থে বলেন,-"আবূ হানীফা রহ.-এর মাসআলার সংখ্যা পাঁচ লাখের মতো" আল্লামা আইনী রহ. তার ইনায়া গ্রন্থে বলেন, "আবূ হানীফা রহ.-এর মাসআলা বারো লাখ সত্তর হাজারের কিছু বেশি।" এর দ্বারা অনুমান করা যায় কী বিশাল ফিকহী ভাণ্ডারই না তিনি গড়ে তুলেছিলেন। আর এ কারণেই পরবর্তী সকল ফিকহ ও মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে আবূ হানীফা রহ.-এর ফিকহকে পুঁজি করে।

উদাহরণতঃ শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম হলেন ইমাম শাফেয়ী রহ.। তিনি ফিকহ শিখেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট থেকে। আর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রথম সারির শিষ্য। মালেকী মাযহাবের প্রবর্তক হলেন, ইমাম মালেক রহ.। তিনিও আবূ হানীফা রহ.-এর ফিকহ থেকে বেশ উপকৃত হয়েছেন। কাযী আবূল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ধারাবাহিক সনদে আব্দুল আযীয আদ দারা ওয়ারদী হতে বর্ণনা করেন, 'ইমাম মালেক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন এবং তা থেকে উপকৃত হতেন।' অন্য এক বর্ণনায় আছে আবূ হানীফা রহ. মদীনা সফরকালে ইমাম মালেক রহ. তাঁর সাথে মসজিদে নববীতে মিলিত হতেন তারপর তারা উভয়ে ইশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত ইলমী আলোচনায় মশগুল থাকতেন। (ফাযাইলু আবী হানীফা, ইবনে আবিল আওয়াম-১০৩)

হাম্বলী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ফিকহ ও হাদীস হাসিল করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে। যাদের ফিকহের ভিত্তি ছিল ফিকহে আবূ হানীফা রহ.। হাফেয আবূল ফাতাহ সাইয়িদুন নাস 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে লিখেন, "হযরত আব্দুল্লাহ আহমাদ

ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমার পিতা (আহমাদ ইবনে হাম্বল) ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে তিন তাক পরিমাণ ইলমে শরী'আহ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি সেগুলো অধ্যয়ন করতেন? আব্দুল্লাহ বললেন, মাঝে মাঝে অধ্যয়ন করতেন।” (আরো দেখুন বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ১০/৩৪৭)

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আবূ হানীফা রহ.-এর পর হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মুহাদ্দিস ও ফকীহের আগমন ঘটেছে তারা সকলেই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং কোন না কোন ইমামের ফিকহের আলোকে জীবন যাপন করেছেন। সুতরাং পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ফিকহের কাছে ঋণী। এমন কি এ কথা বলাও অতিরঞ্জন হবে না যে, ইমাম সাহেব পরবর্তী গোটা মুসলিম যাহান তাঁর ও তাঁর ফিকহের কাছে চিরঋণী। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বিখ্যাত উক্তিটি লক্ষ করুন, মাযহাবের একজন মান্যবর হওয়া সত্ত্বেও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন- الناس عيال ابي حنفة في الفقه

“ফিকহ বিষয়ে সকল মানুষ আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে দায়বদ্ধ। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৬; সিয়ারু আ'লামিন নবালা ৬/৪০৩, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৫০)

তিনি আরও বলেছেন,

ما طالب احد الفقه الا كان عيالا على ابي حنفة

“যে কেউ ফিকহ অন্বেষণ করবে তাকে আবূ হানীফার কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করতেই হবে। (ফাযাইলু আবী হানীফা, ইবনে আবিল আউয়াম ৭)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ফিকহ আহোরণ ও সংকলন পদ্ধতিঃ

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কীভাবে ফিকহ আহরণ করতেন তা স্বয়ং তার যবানীতেই শুনুন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীহ সনদে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর যে নীতিগুলো উল্লেখিত হয়েছে তার সারকথা এই-

১। মাসআলার সমাধান যখন কিতাবুল্লাহতে পাই তখন সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ করি।

২। সেখানে না পেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সহীহ হাদীস আমাদের শিরোধার্য, একে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর শরনাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

৩। এখানে যদি না পাই তাহলে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তগুলোর শরণাপন্ন হই।

৪। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ ও ইজমায়ে সাহাবার সামনে কিয়াস চলতে পারে না। তবে যে বিষয়ে সাহাবীদের একাধিক মত রয়েছে সেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে যে মত কুরআন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী বলে বোধ করি তা গ্রহণ করি।

৫। মাসআলার সমাধান এখানেও পাওয়া না গেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছে থাকি। তবে এ ক্ষেত্রেও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হই না। (আল ইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, ইবনে আব্দিল বার ১২/২১৬-২৬৪, ফাযাইলু আবী হানীফা আবূল কাসিম ইবনু আবিল আউয়াম ২১-২৩, মাখতুত: আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, আবূ আব্দুল্লাহ আস সাইমারী (মৃত্যু ৪৩৬ হি.) পৃষ্ঠা : ১০-১৩, তারিখে বাগদাদ ১৩/৩৬৮, মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা, মুয়াফফাক আল মক্কী ১/৭৪-১০)

ফিকহে মুতাওয়ারাস এর সংকলন এবং ফিকহে জাদীদে আহরণের যে নীতিমালা ইমাম সাহেবের নিজের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল ইমামের সর্বসম্মত নীতি। কোন ফিকহ তখনই ইসলামী ফিকহ হতে পারে যখন তা উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সংকলিত ও আহরিত হয়। ফিকহ সংকলন ও আহরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণে ইমাম সাহেব রহ. কতটুকু সফল হয়েছেন তা তার সমসাময়িক স্বীকৃত ইমামগণের বক্তব্য থেকে জানা যেতে পারে, যারা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি সকল ইসলামী শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. (মৃত্যু-১৬১ হি.) বলেন, "আবূ হানীফা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইলম অন্বেষণ করেছেন। তিনি ছিলেন (দ্বীনের প্রহরী) দ্বীনের সীমানা রক্ষাকারী যেন আল্লাহর হারামকৃত কোন বিষয়কে হালাল মনে করা না হয়। কিংবা হালালের মতো তাতে লিপ্ত না হয়। যে হাদীসগুলো তার কাছে সহীহ সাব্যস্ত হতো অর্থাৎ যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসল্লাম-এর কর্ম থেকে যেটি সর্বশেষ সেটি গ্রহণ করতেন আর কুফার আলেমগণকে যে সকল হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন সে সকল হাদীসও তিনি গ্রহণ করতেন। (কেননা এটাই ছিল সাহাবা যুগ থেকে চলমান আমল ও ধারা) (আল ইনতিকা, ইবনে আব্দিল বার পৃষ্ঠা: ২৬২) ফিকহে হানাফীর ভিত্তিই যখন হাদীস ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন হাদীস ও সুন্নাহর সঙ্গে এর সম্পর্ক কতখানি মজবুত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্যই ইমাম ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, 'আবূ হনীফার ফিকহকে শুধু রায় বলো না। কেননা তা হলো হাদীসের তাফসীর।' (ফাযাইলু আবী হানীফা, ইবনু আবিল আওয়াম-২৩)

সংকলন পদ্ধতি:

১২০ হিজরীতে হাম্মাদ রহ. এর ইন্তেকালের পর ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার আসনে সমাসীন হলেন। এদিকে ইসলামী সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। ইবাদাত ও মু'আমালাত সম্পর্কিত বিষয়াদিতে এত মাসআলা দেখা দিল যে, এর সমাধানে আইনের একটি সুবিন্যস্ত সংকলন ছাড়া কিছুতেই কাজ

চলছিল না। তাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. ফিকহ সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু এই মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে একদল দক্ষ, কর্মঠ ও অভিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন ছিল। সে মতে তিনি তার অগণিত ছাত্রদের মধ্য হতে বাছাই করে চল্লিশ জন দক্ষ ও কর্মঠ ছাত্র নিয়ে ফিকহ বোর্ড গঠন করেন।

ইমাম ত্বহাবী রহ. আসাদ ইবনে ফুরাত হতে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন, "আবূ হানীফা রহ. এর যে সকল ছাত্র ফিকহ সংকলনের কাজ আঞ্জাম দেন তাদের সংখ্যা (৪০) চল্লিশ জন।" এরা হলেন-

১. কাযী আবূ ইউসুফ
২. ইমাম মুহাম্মাদ
৩. ইমাম যুফার
৪. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ
৫. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া
৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
৭. দাউদ ইবনে নুসাইর
৮. হাফস ইবনে গিয়াস
৯. ইউসুফ ইবনে খালিদ
১০. আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ
১১. হিব্বান ইবনে আলী
১২. মুনদিল ইবনে আলী
১৩. আলী ইবনে মুসহীর
১৪. কাসীম ইবনে মা'আন
১৫. আসাদ ইবনে আমর
১৬. ফযল ইবনে মুসা
১৭. আলী ইবনে যারইয়ান
১৮. হিশাম ইবনে ইউসুফ
১৯. ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাত্তান
২০. শুআইব ইবনে ইসহাক
২১. হাফস ইবনে আব্দুর রহমান
২২. হাকাম ইবনে আব্দুল্লাহ
২৩. খালিদ ইবনে সুলাইমান
২৪. আঃ হামিদ ইবনে আব্দুর রহমান

www.muslimdm.com

২৫. আবূ কাসেম যাহহাক ইবনে মাখলাদ
২৬. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম
২৭. হাম্মাদ ইবনে দালীল
২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস
২৯. ফুজাইল ইবনে ইয়ায
৩০. হাইসাম ইবনে বাশীর
৩১. নূহ ইবনে দাররাহ
৩২. যুহাইর ইবনে মুআবিয়া
৩৩. শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ
৩৪. নসর ইবনে আব্দুল কারীম
৩৫. মালিক ইবনে মা'ফুল
৩৬. জাবীর ইবনে খাযিম
৩৭. জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ
৩৮. হাসান ইবনে যিয়াদ
৩৯. হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা
৪০. আবূ ইসমাতা নূহ ইবনে মারয়াম

সংকলন পদ্ধতি ছিল এরূপ, বোর্ডের সামনে কোন একটি মাসআলা পেশ করা হতো। সবাই এ ব্যাপারে এক মত না হলে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে বিতর্ক শুরু হয়ে যেতো। এই বিতর্ক কখনও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আবার কখনও কয়েকদিন পর্যন্ত চলত। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ধ্যান ও ধৈর্য্য সহকারে সকলের বক্তব্য শুনতেন। সবশেষে তিনি এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ফায়সালা পেশ করেন যে, সকলেই তা মানতে বাধ্য হতো। আবার কখনও এরূপ হতো যে, ইমাম সাহেবের ফায়সালার পরও কেউ কেউ নিজ নিজ মতের উপর অটল থাকতেন। তখন ইমাম সাহেবের ফায়সালার পাশাপাশি ওই সব মতগুলোকেও লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হতো। যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ সদস্য কোন ব্যাপারে একমত না হতো ততক্ষন পর্যন্ত কোন মাসআলার ফায়সালা না করার বিধান ছিল। হাফেজ আবূল মাহাসেন রহ.- বলেন, এ সংকলনের বিন্যাস ছিল নিম্নরূপঃ

প্রথমে পবিত্রতার অধ্যায়, অতঃপর নামায ও রোযার অধ্যায়, তারপর ছিল ইবাদতের অন্যান্য অধ্যায়। অতঃপর মু'আমালাত ও লেনদেন এবং সর্বশেষে ছিল উত্তরাধিকারের অধ্যায়। পরবর্তীতে ইমাম মালেক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. সংকলিত ফিকহের এই বিন্যাস অনুযায়ী বিখ্যাত কিতাব মুয়াত্তা সংকলন করেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তিনি লিখেন, "যে বৈশিষ্ট্যে ইমাম আবূ হানীফা রহ. একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা হল,

তিনিই সর্ব প্রথম শরী'আতের ইলমকে সংকলিত করেছেন এবং বিষয় ভিত্তিক বিন্যাসে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করেছেন। এরপর ইমাম মালেক রহ. মুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং সুফিয়ান সাওরীও তার গ্রন্থে ঐ নীতি অনুসরণ করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ আবূ হনীফা রহ.-এর অগ্রবর্তী হতে পারেন নি।'

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে কী পরিমাণ সতর্কতা ও পূর্ণতার সঙ্গে ফিকহ সংকলনের কাজটি আঞ্জাম পেয়েছিল। যা হোক ইমাম সাহেবের জীবদ্দশাতেই এ সংকলন প্রকাশিত হয়ে সকলের নিকট সমাদৃত হয়। এমনকি সে সময় তার সমকক্ষের দাবীদার ব্যক্তিবর্গও তাঁর এ সংকলন থেকে উপকৃত হন।

যায়েদা বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর শিয়রে একটি কিতাব দেখতে পেলাম যে কিতাবটি তিনি পাঠ করছিলেন। অনুমতি নিয়ে আমি কিতাবটি দেখতে লাগলাম। দেখি সেটা আবূ হানীফা রহ.-এর 'কিতাবুর রেহেন' (বন্ধক সংক্রান্ত মাসআলার সংকলন) আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবূ হনীফার কিতাব পাঠ করছেন? তিনি বললেন, আফসোস যদি তাঁর সবগুলো রচনাই আমার কাছে থাকতো।" (হযরত আবূ হানীফা রহ., শিবলী নোমানী পৃ: ১৫৩ বাংলা অনুদিত)

এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ফিকহ সংলন ও গ্রন্থনায় ইমাম সাহেবের কী প্রভাব-বিস্তারক অবদান রয়েছে। তাঁর এই অনবদ্য ও অতুলনীয় অবদানের কথা আজকের কতিপয় আহলে হাদীস বন্ধু অস্বীকার করলেও ইমাম বুখারী রহ.-এর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ কুরাইবী যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হলো, নিজেদের নামাযে ইমাম আবূ হানীফার জন্য দু'আ করা। কেননা তিনি উম্মাহর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও ফিকহ সুরক্ষিত করে গিয়েছেন। (তাহযীবুল কামাল ১৯/১১০)

ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহ. যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও আলেম ছিলেন

ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহ. কর্তৃক ফিকহশাস্ত্র উদ্ভাবন, সংকলন ও অবদানবিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ফিকহশাস্ত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও গভীরতা সম্পর্কে মণীষীবৃন্দের মন্তব্য সবিস্তারে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। যেন অনুসারী বন্ধুরা লাভ করেন দৃঢ় প্রত্যয় আর বদরাগী বান্দারা হয়ে ওঠেন অনুরাগী।

পূর্বে বলা হয়েছে, ফুতুহাতে ইসলামীর ধারাবাহিকতায় যখন অধিকহারে নতুন নতুন অঞ্চলসমূহ ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হতে থাকে এবং সেসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নিত্যনতুন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উদ্ভব ঘটতে থাকে, তখন উক্ত সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-ই সর্বপ্রথম ইসলামী বিধি-বিধানকে সুবিন্যস্ত ও একাডেমিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ

করেন। বস্তুত: কুদরতে ইলাহীর নিকট সকল কাজের জন্যই সময় ও নির্ধারিত থাকে। ফিকহে ইসলামীর ইতিহাসের ধারাক্রম পর্যবেক্ষণ করে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত কাজের জন্য ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর যুগকে নির্ধারণ করেছিলেন। ফলে কুদরাতে ইলাহীই তাঁকে এ কাজের যাবতীয় মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করেছিলেন। তাই তো দেখা যাচ্ছে, একক প্রচেষ্টায় যুগের উল্টো রেওয়ায়েতকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিদের একটি বিশাল দল তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। যাদের মধ্য থেকে বাছাই করে পারদর্শী ও দূরদর্শী চল্লিশজনের সমন্বয়ে তিনি গঠন করেছিলেন মজলিসে ইলমী বা ফিকহ বোর্ড। এই ফিকহ বোর্ড বাইশ বছর পর্যন্ত কুরআন-হাদীস, ইজমা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা ও কিয়াসের মাধ্যমে নিরন্তর গবেষণায় গড়ে তুলেছিলেন বিষয়ভিত্তিক ফিকহের এক বিশাল ভাণ্ডার।

ইমাম আযমের পূর্ববর্তী যুগে ফিকহ কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র ছিল না। তিনিই এ শাস্ত্রের জনক ও প্রাণপুরুষ। শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. লিখেছেন,

ومن مناقب الامام أبي حنيفة التي انفردبها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا ثم تبعه مالك بن أنس في ترتيب الموطا و لم يسبق أبا حنيفة.

"ইমাম আবূ হানীফ রহ.-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনিই সর্বপ্রথম ইলমে শরী'আতের সংকলন করেছেন এবং একে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। তারপর ইমাম মালেক মুয়াত্তার বিন্যাসে তা অনুসরণ করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর পূর্বে একাজ কেউ আঞ্জাম দেননি। (তাবয়ীযুস সহীফা পৃ.১৪৪)

সাহাবায়ে কেরামের যুগেই কূফা নগরী ইলমের মারকাযে পরিণত হয়। কূফা ছিল ইসলামী বীর সেনানীদের ছাউনী। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক রা. প্রখ্যাত ফকীহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে মুফতী ও মু'আল্লিম হিসেবে কূফায় পাঠিয়েছিলন। তিনি হযরত উসমান রা.-এর খেলাফতের শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনেরো বছরব্যাপী চরম আত্মত্যাগ ও পরম সাধনার মাধ্যমে কূফা নগরীতে ফুকাহা অর্থাৎ ইসলামী আইন গবেষকদের একটি বিশাল জামা'আত গড়ে তোলেন। হযরত আলী রা. কূফার এই চিত্র দেখে বিস্মিত হন এবং ইবনে মাসউদ রা.কে লক্ষ্য করে বলেন, ملئت هذه القرية علما وفقها 'আপনি তো এই জনপদকে ইলম ও ফিকহ দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন।' পরবর্তীতে হযরত আলী রা.-এর খেলাফতকালে কূফা নগরী ইসলামী খেলাফতের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং ইলম ও ফিকহের পঠন-পাঠন আরও জোরদারভাবে চলতে থাকে। পূর্বেও বলা হয়েছে কূফা নগরীতে প্রায় পনেরো শত সাহাবীর বসবাস ছিল। তাদের ৭০ জন ছিলেন বদরী আর ৩০০ জন বাইয়াতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী, তাদের পদচারণায় খেলাফতের রাজধানী কূফা, ইলমেরও রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

কূফা নগরীতে ইলমে ফিকহের দরস ও তাদরীসের সিলসিলা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত ছিল। দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষ দলে দলে কূফার ফকীহদের দরসে হাজির হতেন। কূফার ফুকাহায়ে কেরাম যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহকেই তাদের দরসের মসনদে আসীন করতেন। কূফা নগরীর ঐতিহ্যবাহী সেই ইলমী মসনদে পর্যায়ক্রমে সমাসীন ছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী রা. । তৎপরবর্তীতে বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আলকামা রহ., তাঁর পরে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. তার পরে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ., তাঁর পরে কূফার ইলমী মসনদে সমাসীন হন ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.। এই ধারাক্রমই বলে দিচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্ববরেণ্য অসংখ্য উলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম। উদরহণতঃ

১. বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, রিজালশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম হাফেয যাহাবী রহ. বলেন,

أفقه أهل الكوفة على وابن مسعود وافقه أصحابهما علقمة وافقه أصحابه ابراهيم النخعي وافقه اصحاب ابراهيم حماد وافقه اصحاب حماد ابو حنيفة ألخ:

“কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ হলেন আলী ও ইবনে মাসউদ রা., তাদের শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলকামা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইবরাহীম নাখয়ী। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হাম্মাদ। হাম্মাদের শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবূ হানীফা। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২৩৬)

২. হাফেয যাহাবী রহ. অন্য এক স্থানে ইমাম আযমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الامام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة عن بطلب الأثار وارتحل في ذلك واما الفقه والتدقيق في الرأى وغوامضه فاليه المنتهي والناس عليه عيال في في ذلك .

“আবূ হানীফা রহ. যিনি ছিলেন ইমাম, মুসলিম মিল্লাতের ফকীহ, ইরাকের বিশিষ্ট আলেম, তিনি হাদীস অন্বেষণের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে সফর করেছেন। ইলমে ফিকহের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে তিনিই সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এ ব্যাপারে সকল মানুষ তার কাছে দায়বদ্ধ। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯০)

৩. ফিকহী আহকাম নিরূপণে ইমাম সাহেবের নীতি ছিল বিস্ময়কর ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম । তিনি প্রতিটি মাসআলার দলীল গ্রহণ ও মান নিরুপণে এমন সুদক্ষ ছিলেন যে, তার দক্ষ শিষ্যগণও হতবাক হয়ে যেতেন। ইমাম সাহেবের বিস্ময়কর এ যোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ. মন্তব্য করেছেন:

هذا رجل لواراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب لا ستطاع.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তো এমন এক ব্যক্তি, এই স্তম্ভটিকে দলিলের মাধ্যমে স্বর্ণ বলে প্রমাণ করতে চাইলে অবশ্যই তাতে সক্ষম হবেন। (আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী পৃ. ৪৪২)

www.muslimdm.com

৪. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শায়েখ ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. বলেন,

ما لقيت أحدا أفقه من أبي حنيفة

‘আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ফকীহর সাক্ষাৎ পাইনি।’ (তারীখে বাগদাদ ১২/২৪৫)

৫. স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

من أراد أى يعرف الفقيه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه .

“যে ব্যক্তি ইলমে ফিকহ শিখতে চায় সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার শিষ্যদেরকে আঁকড়ে ধরে। কেননা সকল মানুষ ফিকহ বিষয়ে আবূ হানীফা রহ. এর নিকট দায়বদ্ধ। (তারীখে বাগদাদ-১৩/২৮৬)

৬. মুহাম্মাদ ইবনে বিশর বলেন,

كنت اختلط الى أبي حنيفة وسفيان الثورى فاتيت سفيان الثورى فيقول من أين جئت؟ فاقول من عند أبي حنيفة فيقول : لقد جئت من عند أفقه الأرض .

“আমি ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। একদা সুফিয়ান সাওরীর নিকট গমন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা হতে এলে? বললাম, আবূ হানীফার নিকট থেকে। শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, তুমি তো ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ফকীহর নিকট থেকে এসেছো। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ. ২১০)

৭. শামসুল আইম্মাহ হুলওয়ানী রহ. বলেন,

قلت لأبي عاصم النبيل : أبو حنيفة أفقه أو السفيان؟ قال أبو حنيفة عندى أفقه من سفيان .

“আমি আবূ আসেম নাবীলকে জিজ্ঞেস করলাম, আবূ হানীফা বড় ফকীহ নাকি সুফিয়ান সাওরী? তিনি বললেন, আমার দৃষ্টিতে সুফিয়ানের তুলনায় আবূ হানীফা শ্রেষ্ঠ ফকীহ। (তারীখে বাগদাদ-১৩/৩৪২)

৮. হুসাইন ইবনে ইবরাহীম বলেন,

سمعت أبا بكر بن عياش يقول : كان النعمان بن ثابت فهما من أفقه أهل زمانه .

“আমি আবূ বকর ইবনে আইয়াশকে বলতে শুনেছি, আবূ হানীফ ছিলেন তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ। (ফাযাইলু আবী হানীফা পৃ.৮১)

৯. নসর ইবনে শুমাইল বলেন,

كان الناس نياما في الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما تفقه وبينه ولخصه.

“ফিকহের ব্যাপারে সকলে ঘুমিয়ে ছিল। আবূ হানীফা রহ. ফিকহ চর্চা ও গবেষণার মাধ্যেমে তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। (তাবয়ীযুস সহীফা পৃ. ২৪)

১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলতেন,

أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله.

www.muslimdm.com

“আবূ হানীফা রহ. মানবকুলের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। এ ব্যাপারে কাউকে তার সমতুল্য দেখিনি। (তাবয়ীযুস সহীফা পৃ. ২৪)

১১. আবূ হাইয়্যান তাওহীদী রহ. বলেন, ...

الملوك عيال عمر اذا اساسوا والفقهاء عيال أبي حنيفة اذا قاسوا والمحدثون عيال على أحمد بن حنبل اذا اسندوا.

“শাসকবর্গ রাজনীতির ব্যাপারে হযরত উমরের নিকট দায়বদ্ধ। ফুকাহয়ে কেরাম কিয়াস প্রশ্নে ইমাম আবূ হানীফার নিকট দায়বদ্ধ। আর মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট দায়বদ্ধ। (মানাকিবুল কারী পৃ. ৪৬১)

১২. হাফেয সাম‘আনী রহ. স্বীয় কিতাব আল আনসাব এ লেখেনঃ

رأى أبو حنيفة في المنام أنه ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لمحمد بن سيرين فقال : صاحب هذه الرؤيا يثور علما لم يسبقه أحد قبله .

“ইমাম আবূ হানীফা রহ. একদা স্বপ্নে দেখেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খনন করছেন। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে (বা অন্য কোনো বুযুর্গকে) এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই স্বপ্নদ্রষ্টা ইলমের এমন একটি ভিত্তি রাখবেন, যা এ পর্যন্ত অন্য কেউ রাখতে পারেনি। (কিতাবুল আনসাব : সাম’আনী)

১৩. প্রখ্যাত তাবেঈ ইসরাঈল রহ. বলেন,

كان نعم الرجل النعمان ما كان احفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه وأعلمه بما فيه من الفقه.

“ইমাম আবূ হানীফা রহ. কেমন বিস্ময়কর ব্যক্তি। কী বিস্ময়করভাবেই না তিনি ফিকহসংবলিত হাদীসসমূহ মুখস্ত করে নিতেন। হাদীস থেকে ফিকহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অগ্রগামী কাউকে দেখিনি। হাদীসের ফিকহ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার সেরা। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৯)

১৪. ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন,

ما رأيت احدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة)

হাদীস ও হাদীসের ফিকহ সংবলিত সূক্ষ্ম স্থানের ব্যাখ্যাদানে আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪০)

১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন,

ان كان الأثر قد عرف واحتج الى الرأى فرأى مالك وسفيان وأبي حنيفة وأبو حنيفة أحسنهم وادقهم فطنة وأغوصهم على الفقه وهو أفقه الثلاثة .

“যদি কোনো হাদীসে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে ইমাম মালেক রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ. ও ইমাম আবূ হানীফা রহ.- এর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা রহ. হলেন সর্বোত্তম, সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী ও ফিকহশাস্ত্রে অধিক মনোযোগী। তিনজনের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ফকীহ। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৩)

১৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আরও বলেন, আমি হাসান ইবনে উমারাকে আবূ হানীফা রহ. -এর বাহন ধরা অবস্থায় দেখেছি, তিনি বলছিলেন, আল্লহার কসম! আমরা আপনার মতো ফিকহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গতর এবং সংক্ষিপ্ততর কথা বলতে আর কাউকে দেখিনি। আপনার সমসাময়িক যারা ফিকহ নিয়ে গবেষণা করছে আপনি হচ্ছেন তাদের সরদার। কেবল হিংসুকেরাই আপনার সমালোচনা করে থাকে। (মুকাদ্দামা : ই’লাউস সুনান পৃ. ১১)

১৭. হাফেয সাম’আনী রহ. বলেন,

دخل يوما على المنصور وكان عنده عيسى بن موسى فقال للمنصور : هذا عالم الدنيا اليوم.

“ইমাম আবূ হানীফা রহ. একদিন খলীফা মানসুরের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে ঈসা ইবনে মূসাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাকে বললেন, ইনি (আবূ হানীফা রহ. বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। (কিতাবুল আনসাব লিস সাম’আনী)

১৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, আমি কূফায় সেখানকার উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দেশের সবচেয়ে বড় আলেম কে? সকলে একবাক্যে উত্তর দিলেন, ইমাম আবূ হানীফা। তারপর আমি যেকোনো উত্তম গুণাবলী ও কৃতিত্বের ব্যাপারেই জানতে চাইলাম। তারা সবাই বললেন, ইমাম আবূ হানীফা ব্যতীত এসব গুণের অধিকারী অন্য কাউকে আমরা দেখি না। কেউ আছে বলেও আমাদের জানা নেই। (মীযানুল কুবরা লিশ শা’রানী ১/৮৭)

১৯. ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন,

ادركت ألف رجل وكتبت عن أكثرهم ما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولا أعلم من خمسة أولهم أبو حنيفة .

“আমি প্রায় একহাজার আলেমদের সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তাদের অনেকের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছি। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে পেয়েছি, যাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও শ্রেষ্ঠ খোদাভীরু ও শ্রেষ্ঠ আলেম। আর তাদের সেরা জন হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. (জামেউ বয়ানিল ইলম ১/২৯)

২০. শাদ্দাদ ইবনে হাকীম বলেন, ما رأيت أعلم ن أبي حنيفة

“আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চেয়ে বড় কোনো আলেম দেখিনি। (তারীখে বাগদাদ)

২১. ইমাম বুখারী রহ. -এর শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন,

أبو حنيفة كان أعلم أهل زمانه.

“আবূ হানীফা রহ. ছিলেন স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম।’

তো দেখা যাচ্ছে, সর্বযুগের সত্য ও ইনসাফ প্রিয় উলামায়ে কেরাম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। অকুণ্ঠচিত্তে তারা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। সুতরাং যেসব বন্ধু ইমাম আযম রহ. ও তার মাযহাবের সমালোচনাকে নিজেদের যিন্দেগীর অজিফা বানিয়ে নিয়েছেন তারা একটু ভেবে দেখবেন কী? হিংসা কিংবা অজ্ঞতাবশত তারা কোন মহান ব্যক্তিত্বকে আহত করছেনঃ শেখ সাদী কী চমৎকার বলেছেন,

راست خاهي هزار چشم جهاں كور بهتر كها آفتاب سياه.

সত্য শুনতে চাও, তো বলি- চামচিকার হাজারো চোখ অন্ধ থাকা মেনে নেবো এক সূর্য আলোহীন হওয়ার চেয়ে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন

পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ. যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন। আর ফিকহের উৎস হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। কাজেই ফকীহ ও মুজতাহিদের জন্য ফিকহের উৎসসমূহের ওপর সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাণ্ডিত্য থাকা অপরিহার্য একটি বিষয়। সুতরাং কাউকে ফকীহ স্বীকার করে নেয়ার পর এই প্রশ্ন তোলা যে, হাদীসের ওপর তার দখল ছিল না নিতান্তই যুক্তিহীন ও গর্হিত কাজ। আহলে হাদীস ভাইয়েরা বলে বেড়ান যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন, তার মাত্র সতেরটি হাদীস জানা ছিল। পীর মাওলানা যুলফিকার আলী দা.বা. এই ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডার মোক্ষম জবাবটি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, ব্যাপারটি যদি বাস্তবিকই এমন হয়ে থাকে তাহলে তো হানাফী মাযহাবকে আমরা আরও মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকব: কিছুতেই এর থেকে বিচ্যুত হব না, কারণ মাত্র সতেরটি হাদীসের ওপর গবেষণা করে যিনি দ্বীনের সকল বিষয়ে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষাধিক ফিকহী মাসাইল উম্মতকে উপহার দিতে পারেন এবং হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে তা কিতাবের পাতায় ও উম্মতের আমলের খাতায় অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে, তার মাযহাব না মেনে উপায় কী? ইমামে আযমের প্রতি হাদীস না জানার অপবাদ আরোপকারীদেরকে কে বোঝাবে যে, স্বল্প পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা আর হাদীস জানা না থাকা এক বিষয় নয়। দুধ থেকে মিষ্টিদ্রব্য প্রস্তুতকারীকে দুধও বিক্রি করতে হবে এমন উদ্ভট শর্ত কেউ আরোপ করেছে কোনো দিন? রেওয়ায়েত কম বলে সাইয়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দিক রা. হাদীস কম জানতেন। কিংবা হাদীস শাস্ত্রে তিনি দুর্বল ছিলেন এমন দাবি করে নিজের মুর্খতা জানান দিতে তো গণ্ডমুর্খও রাজি হবে না।

বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা একেক মানুষকে একেক কাজের প্রতি আগ্রহী ও রুচিশীল করে সৃষ্টি করেছেন। বহুকাজে দক্ষতা ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও সময়ের দাবি ও রুচি বৈচিত্র্যের কারণে কর্মবিশেষের প্রতি মানুষের ঝোঁক ও প্রবল আগ্রহ থাকে। ফলে মানুষ সে কাজে তার মেধাও শ্রম অকাতরে বিলিয়ে দেয়। তারপর এক সময় অন্য সকল পারদর্শিতা ছাপিয়ে সেই কর্মবিশেষের সঙ্গেই তার নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা ইমামে আযম রহ. কে ফিকহের আগ্রহ ও রুচি সর্বাধিক পরিমাণে দান করেছিলেন। আর ফিকহ সংকলনও ছিল সময়ের দাবি। ফলে বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও তিনি ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ইমাম বুখারী রহ. মুহাদ্দিস হিসেবে। অথচ তিনি একজন মুজতাহিদ ফকীহও ছিলেন।

এবার হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আযম রহ. এর পাণ্ডিত্য, বুৎপত্তি ও উৎকর্ষের ব্যপারে শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ও সর্বজনমান্য মনীষীদের উক্তির প্রতি নজর ফেরানো যাক।

হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইমামে আযমের দেশ সফর ও তার উস্তাদবৃন্দঃ

কুফা নগরীর অধিবাসী হওয়ায় স্বভাবতই এই শহরে তার হাদীস শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। ইমাম সাহেবের কুফানগরীর মুহাদ্দিস উস্তাদগণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. কুফার ৯৩ (তিরানব্বই) জন মুহাদ্দিস তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর কুফা নগরীর ২৯ জন হাদীসের উস্তাদের অধিকাংশ ছিলেন বড় বড় তাবেঈ। তাদের মধ্যে ইমাম শাবী, সালামা ইবনে কুহাইল, মুহারিব ইবনে দিসার, আ‘মাশ, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ, আদী ইবনে মারসাদ, আমর ইবনে মুররাহ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুফা নগরীর পর হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বসরা গমন করেন। এ শহরে তার হাদীসের উস্তাদ ছিলেন হযরত হাসান বসরী, শুবা, কাতাদা প্রমুখ বিশিষ্ট তাবেঈগণ। তারপর এতোদুদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফাইনসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সফর করে সমকালীন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদে পরিণত হন। মক্কা নগরীতে তার হাদীসের অন্যতম উস্তাদ ছিলেন আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.। হাফেয যাহাবী রহ. বলেন.وسمع الحديث من عطاء ابن ابي رباح بمكة ইমাম আবূ হানীফা রহ. মক্কায় আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৫০) হারেস ইবনে আব্দুর রহমান বলেন,

كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض فاذا جاء أبوحنيفة اوسع له وادناه

‘আমরা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. এর দরসে একজনের পেছনে আরেকজন উপবেশন করতাম। যখন আবূ হানীফা রহ. উপস্থিত হতেন

www.muslimdm.com

আতা রহ. তার জন্য মজলিস প্রশস্ত করে দিতেন এবং তাকে কাছে নিয়ে বসাতেন (মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস পৃ:১৯)

হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের এসব সফর শেষে ইমাম আযম রহ. এ শাস্ত্রের সকল শাখায় কী পরিমাণ গভীরতা ও বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তা তারই এক শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মুখে শুনুন। তিনি বলেন,

ان اباحنيفة اذا استنبط مسئلة ذهبت الى شيوخ الكوفة لجمع الاحاديث فرجعت واسمعته الاحاديث ليفرح فيتكلم في الاحاديث كلها فلايحتج به ثم قال : انا اعلم بعلم اهل الكوفة.

অর্থঃ ইমাম আবূ হানীফা রহ. যখন দলিল উল্লেখ না করে কোনো মাসআলা বর্ণনা করতেন, আমি তার বর্ণিত মাসআলার সমর্থনে হাদীস সংগ্রহ করতে কুফার মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করতাম। তারপর ফিরে এসে সংগৃহীত হাদীসগুলো তাকে শোনাতাম যেন তিনি খুশি হন। হাদীসগুলো শ্রবণ করে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সকল হাদীসের বক্তব্য ও বর্ণনাকারীদের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করে বলে দিতেন যে, এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। তারপর বলতেন, কুফাবাসীদের নিকট যত ইলম আছে তার সবই আমার জানা। (মানাকিবে আবী হানীফা, মোল্লা আলী কারী)

হাদীস শাস্ত্রে ইমামে আযম রহ. এর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, প্রাজ্ঞতা ও উচ্চ মাকাম সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

১. জারহ ও তা'দীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

كان ابو حنيفة ثقة صدوقا في الفقه والحديث مامونا على دين الله.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে আস্থাভাজন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৫০)

২. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন,

كان ابو حنيفة زاهدا عالما راغبا في الاخرة صدوق اللسان احفظ اهل زمانه.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. দুনিয়া বিমুখ, আলেমে দ্বীন, আখেরাতে অনুরাগী, সত্যভাষী ও যুগশ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ছিলেন। (মানাকিবুল ইমামিল আযম, ছদরুল আইম্মা মক্কী রহ. পৃ: ১৭০)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, كان والله ورعا حافظا للسنة

আল্লাহর কসম! আবূ হানীফা রহ. সর্বাধিক খোদাভীরু ও হাফেযে হাদীস ছিলেন। (মানাকিবে আবী হানীফা, মুওয়াফফক মক্কী- ১৮০)

৪. ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাত্তান রহ. বলেন,

انه والله لاعلم هذه الامة بماجاء عن الله وعن رسوله

www.muslimdm.com

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আবূ হানীফা রহ. আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের হাদীস সম্পর্কে এই উম্মতের সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। (আল ইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান পৃ: ৫১, মুকাদ্দিমাতু কিতাবিত তালীম ১৩৪)

৫. প্রখ্যাত তাবেঈ ইসরাইল রহ. বলেন,

كان نعم الرجل النعمان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه

ইমাম আবূ হানীফা নুমান এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। কী আশ্চর্যজনকভাবেই না তিনি ফিকহসম্বলিত সকল হাদীস মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৯)

৬. ইমাম খালক ইবনে আইয়ূব রহ. বলেন,

صار العلم من الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار الى اصحابه ثم صار الى التابعين ثم صار الى ابي حنيفة واصحابه فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط.

ইলমে শরী‘আত আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। তাঁর ইলম সাহাবীদের নিকট পৌঁছেছে। তাদের ইলম তাবেঈদের নিকট পৌঁছেছে। অবশেষে তাবেঈদের ইলম আবূ হানীফা রহ. ও তার শিষ্যদের নিকট পৌঁছেছে। অতএব, যার ইচ্ছা সে সন্তুষ্ট হোক আর যার ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হোক। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৬)

৭. খতীবে বাগদাদী রহ. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, كان ابو حنيفة لايحدث بالحديث الاما يحفظ ولايحدث مالايحفظ.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কখনো মুখস্ত নেই এমন হাদীস বর্ণনা করতেন না। (তারীখে বাগদাদ, ১৩/৪৪৯)

৮. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন,

كان ابوحنيفة ثقة لايحدث بالحديث الا ما يحفظ ولايحدث بمالايحفظ.

আবূ হানীফা রহ. বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি কেবল মুখস্ত হাদীসই বর্ণনা করতেন, যা তার মুখস্ত নেই তিনি তা বর্ণনা করতেন না।

৯. ইয়াহইয়া ইবনে নসর রহ. বলেন,

سمعت اباحنيفة يقول! عندى صناديق من الحديث ماخرجت منها الااليسير الذى ينتفع به.

আমি আবূ হানীফা রহ. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার নিকট হাদীসের বহু সিন্দুক রয়েছে। তা থেকে উপকারী অল্প কিছু হাদীসই আমি বর্ণনা করেছি মাত্র। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ. ২১১)

১০. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আলী ইবনুল জাদ রহ. বলেন,

ابو حنيفة اذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر.

আবূ হানীফা রহ. যখন হাদীস বর্ণনা করেন মনে হয় যেন মণি-মুক্তা বর্ষণ করছেন। (অর্থাৎ কেবল সহীহ ও মূল্যবান হাদীসগুলো বর্ণনা করেন।) (মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা. আ. রশীদ নুমানকৃত পৃ. ৫৮, জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আযম, খাওয়ারিজমী ২/৩০৮)

১১. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী রহ. বলেন,

كان ابو حنيفة من كبار حفاظ الحديث واعيانهم ولولاكثرة اعتنائه بالحديث ماتهيأله استنباط مسائل الفقه.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বড় বড় হাফেযে হাদীস ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যদি হাদীসের প্রতি অত্যাধিক মনোযোগী না হতেন তাহলে ফিকহের এত মাসআলা উদ্ভাবন করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিস পৃ: ২৮৪)

১২. ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন,

مارأيت احدا اعلم بتفسير الحديث من ابي حنيفة وكان ابو حنيفة ابصر بالحديث الصحيح مني.

হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ. ২১)

১৩. একবার ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. কে আবূ হানীফা রহ. এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন,

عدل ثقة ماظنك بمن عدله ابن المبارك ووكيع.

আবূ হানীফা রহ. বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ওয়াকী রহ. এর মতো ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? (মুকাদ্দামাতু কিতাবিল আসার পৃ: ৮)

১৪. উকুদুল জুমান নামক গ্রন্থে আছে,

كان بصيرا بعلل الاحاديث والتعليل والتجريح

আবূ হানীফা রহ. হাদীসের ইলাল, জরহ ও তাদীল (হাদীসের সনদ ও মতনের ত্রুটি-বিচ্যুতিবিষয়ক সূক্ষ্মতর বিচারবোধ) সম্পর্কে দূরদর্শী ও বোদ্ধা ছিলেন। (উকুদুল জুমান ফী মানাকিবে আবী হানীফাতান নুমান পৃ: ১৬৮)

১৫. বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম শু'বা রহ. বলেন,

كان والله حسن الفهم جيد الحفظ.

আল্লাহর কসম করে বলছি, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর বুঝশক্তি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের আর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ: ৩৪)

১৬. আবূ দাউদ শরীফ প্রণেতা ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী রহ. বলেন,

رحم الله مالكا كان اماما رحم الله الشافعي كان اماما رحم الله اباحنيفة كان اماما.

আল্লাহ তা'আলা মালেক, শাফেয়ী ও আবূ হানীফার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তারা তো ইমাম ছিলেন। অর্থাৎ উম্মতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। (ইমাম আবূ দাউদ রহ. এর মতো জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাউকে মুসলমানদের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করবেন আর তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হবেন, এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।)

১৭. শাইখুল ইসলাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ. বলেন,

كان ابوحنيفة نقيا تقيا زاهدا عابدا عالما صدوق اللسان احفظ اهل زمانه.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. পবিত্রাত্মা, খোদাভীরু, দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুজার, যবরদস্ত আলিম, সত্যভাষী এবং সমকালীন সকলের চেয়ে বড় হাফেযে হাদীস ছিলেন। (মুকাদ্দিমাতু কিতাবিল আসার পৃ: ৮, মানাকিবু আবী হানীফা, সাইমুরী)

১৮. ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবনে সাঈদ রহ. কে একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

هو ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن اللحجاج يكتب اليه ان يحدث ويأمره وشعبة شعبة!!

ইমাম আবূ হানীফা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। (হাদীসের ক্ষেত্রে) আমি কাউকেই তাকে দুর্বল বলতে শুনিনি। এই যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস শুবা ইবনুল হাজ্জাজ তিনি স্বয়ং আবূ হানীফা রহ. কে হাদীস বর্ণনা করতে চিঠি লিখেছেন এবং তাকে এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর ইমাম শুবাতো শুবাই। অর্থাৎ তার মতো হাদীস বিশেষজ্ঞ বিরল। সুতরাং তিনি যাকে চিঠি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করার নির্দেশ দেন তার সম্পর্কেই বা তোমাদের কী ধারণা? (তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৬৮, আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/৫৬)

১৯. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন,

قدانتخب ابو حنيفة كتاب الاثار من اربعين الف حديث.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. চল্লিশ হাজার হাদীস হতে বাছাই করে কিতাবুল আসার গ্রন্থটি সংকলন করেন। (আল খাইরাতুল হিসান পৃ. ২১১)

২০. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

مارأيت احدا اقدمه على وكيع وكان يفتي برأى ابي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا.

আমি ইমাম ওয়াকীর ওপর প্রাধান্য দেয়া যায় এমন কাউকে দেখিনি। অথচ তিনিও ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতানুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন; তার সকল

হাদীস মুখস্ত করতেন। আর তিনি তার থেকে প্রচুরসংখ্যক হাদীস শিক্ষা করেছেন। (হাশিয়ায়ে মুসনাদুল ইমামিল আযম পৃ. ৬১, মুকাদ্দামাতু ইলাইস সুনান পৃ. ১৬)

২১. ইমাম আ'মাশ রহ. বলেন,

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل احذت بكلاالطرفين.

হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরা উম্মতের চিকিৎসক আর আমরা মুহাদ্দিসগণ ওষুধ বিক্রেতা। আর হে আবূ হানীফা! আপনি একাধারে চিকিৎসক ও ওষুধ বিক্রেতাও। (অর্থাৎ আপনি ফকীহও মুহাদ্দিসও) (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/৮৪)

২২. খতীবে বাগদাদী রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ কোরাইবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

يجب على اهل الاسلام ان يدعوا لابي حنيفة في صلاتهم لحفظه عليهم السنة والفقه.

মুসলমানদের উচিত প্রত্যেক নামাযের পর আবূ হানীফা রহ. এর জন্য দুআ করা। কারণ, তিনি তাদের জন্য হাদীস ও ফিকহ সংরক্ষণ করেছেন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৪)

২৩. লা মাযহাবী বন্ধুদের গর্ব ও অনুসৃত ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি বক্তব্য পেশ করেই এ আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি। তিনি বলেন,

ائمة اهل الحديث والتفسير والفقه مثل ائمة الاربعة واتباعهم.

চার ইমাম ও তাদের শিষ্যদের মতো ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম। (মিনহাজুল সুন্নাহ ১/১৭২)

উপরোক্ত জগদ্বিখ্যাত মনীষীবৃন্দের বক্তব্য ও বিশেষতঃ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মন্তব্যের দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ. শুধু একজন ফকীহই ছিলেন না; তিনি ছিলেন দ্বীনী সকল বিষয়ে এবং সকল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত। বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন সূক্ষ্মদর্শী মুহাদ্দিস ও সুদক্ষ হাদীস বিশারদ। আজ যারা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য অথবা নির্ভেজাল শত্রুতার বশে ইমাম সাহেবকে হাদীস শাস্ত্রে অজ্ঞ ও দুর্বল বলে প্রচার করেন তাদের প্রতি আরজ, অনুগ্রহপূর্বক উট পাখির নীতি অবলম্বন করবেন না। কাগজ কলমের অপব্যবহার করে উপর্যুক্ত মনীষীদের সব মন্তব্যকেই না হয় দুমড়ে-মুচড়ে দিবেন কিন্তু ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন আর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. কে কিভাবে পিঠ দেখাবেন? আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আপন মত ও পথকে পুনর্বিবেচনা করে দেখুন। আল্লাহর বাণী শাশ্বত ও চিরন্তন 'আর যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্যঃ

হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডারে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আমাদেরকে সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সুন্নাহ অনুসরণের বিনিময়ে কামিয়াবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেন,

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله.

আমি তোমাদের মাঝে দু’টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে রাখবে, কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক হা. ৬৮৫)

এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রষ্টতা থেকে সুরক্ষার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে শেষ যামানায় ভ্রান্তদলের কার্যক্রম বোঝাতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন,

يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث مالم تسمعوا انتم ولاابائكم فاياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم.

আখেরী যামানায় অনেক দাজ্জাল ও চরম মিথ্যুক লোকের আবির্ভাব হবে। তারা তোমাদের নিকট এমন এমন হাদীস পেশ করবে, যা তোমরা শোননি। তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনেনি। সাবধান! তোমরা নিজেদেরকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে চলবে। যেন তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং ফেতনায় ফেলতে না পারে। (মুসলিম শরীফ হা. ৭)

এই হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রান্তদলের কার্যকলাপ বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, তারা এমন সব হাদীস বলে তোমাদেরকে ধোঁকা দেবে, যা তোমরা কেউ শোননি। দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি সুন্নাহ মেনে চলা ও তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, অন্যদিকে হাদীসের নাম ভাঙ্গানো ফেতনাকারীদের থেকে সতর্ক করছেন। এ জন্য বুঝতে হবে, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী? সুন্নাহ এর আভিধানিক অর্থ পথ। উদ্দেশ্য উম্মতের চলার পথ। আর সুন্নাহ বলা হয় ওই হাদীসকে যার মধ্যে দুটো শর্ত পাওয়া যায়। অর্থাৎ দুটি শর্ত পাওয়া গেলে শরী‘আতের পরিভাষায় সেই হাদীসকে সুন্নাহ বলা হবে। প্রথম শর্তঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি উম্মতের আমলের জন্য বলেছেন। দ্বিতীয় শর্তঃ হাদীসের বিধানটি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল; রহিত হয়নি।

প্রথম শর্তের ব্যাখ্যা

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক কথা ও কাজ এমন ছিল, যা তার নিজের সঙ্গে বা কোনো সাহাবীর সঙ্গে বা কোনো স্থানের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল।

এসব কথা ও কাজকে সুন্নাহ বলা যাবে না। উদাহরণত, তিনি একই সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী নিজের অধিকারে রেখেছেন। এতজন স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তা করতে বাধ্য হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা হাজার হাজার মহিলা সাহাবীদের মধ্যে দ্বীনের তালীম প্রচারের বৃহত্তর স্বার্থে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতগুলো স্ত্রী বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। যেন এদের মাধ্যমে উম্মতের মহিলাগণ তাদের জরুরী মাসআলা মাসাইল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনে নিতে পারেন। হাদীসের কিতাবসমূহে সাধারণ মহিলাদের কর্তৃক উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দ্বীনের জরুরী বিষয়াদি জিজ্ঞেস করে করে আমল করার বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। যা হোক তিনি এক সাথে এতগুলো স্ত্রীকে নিজের অধিকারে রেখেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি কি আমাদের জন্যও তা করার অনুমতি দিয়েছেন? না, বরং এই বিধান একমাত্র তার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জন্য কিছুতেই তা জায়েয নয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হলেও এটাকে সুন্নাহ বলা যাবে না। তেমনিভাবে যে আমলটি তিনি দু’একবার করেছেন যেমন উজরের কারণে তিনি ২/১ বার দাঁড়িয়ে প্রসাব করেছেন এটাকেও সুন্নাত বলা যাবে না। হ্যাঁ, বৈধ বলে আখ্যায়িত করা যাবে।

দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যা

কোনো হাদীস সুন্নাহ হওয়ার জন্য তার বিধানটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত বহাল থাকতে হবে, রহিত হতে পারবে না। দেখা গেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের উদ্দেশ্য অনেক বিধিনিষেধ বর্ণনা করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা‘আলা অন্য নির্দেশ দিয়ে তা রহিত করে দিয়েছেন। যেমনঃ ইসলামের প্রথম যুগে নামাযরত অবস্থায় কথা বলা বৈধ ছিল; কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গিয়েছে।

عن عبد الله قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة شغلا.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নামাযের মধ্যে সালাম করতাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। তারপর আমরা যখন নাজাশীর কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, আমি তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না এবং (নামায শেষে) বললেন, নিশ্চয়ই নামাযে মগ্নতা রয়েছে। (যে কারণে কথা বলা নিষেধ) (বুখারী শরীফ হা. ১১৯৯)

عن ابي عمرو الشيباني قال قال في زيد بن ارقم: ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا الله قانتين. فامر الله بالسكوت.

অর্থঃ হযরত আবূ আমর আশ শাইবানী রহ. বলেন, আমাকে যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেছেন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় নামাযে কথা বলতাম। আমাদের কেউ তার পার্শ্ববর্তীর সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলত। তারপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো 'তোমরা নামাযসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান হও এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সমীপে দণ্ডায়মান হও আদবের সাথে অনুগত হয়ে।' তখন আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। (বুখারী শরীফ হা. ১২০০)

অনুরূপ এক যামানায় মুক্তাদীদের জন্য ইমামের হুবহু অনুকরণের নির্দেশ ছিল অর্থাৎ ইমাম বসে নামায পড়ালে মুক্তাদীদেরকেও বসে বসে তার ইক্তিদা করতে হতো। যেমন হাদীসে এসেছে,

عن انس بن مالك الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الايمن قال انس فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا ورائه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما وفي رواية واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون.

অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় আরোহণ করলেন, অতঃপর পড়ে গিয়ে ডান দিকে আঘাত পেলেন। আনাস রা. বলেন, সেদিন তিনি আমাদেরকে বসে বসে নামায পড়ালেন। আমরাও তার পেছনে বসে বসে নামায পড়লাম। তারপর তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, ইমাম বানানো হয়েছে তার অনুসরণের জন্য। সুতরাং তিনি যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ান তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। অন্য বর্ণনায় আছে, আর যখন তিনি বসে নামায পড়ান তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে। (বুখারী শরীফ হা. ৭৩২-৭৩৪)

কিন্তু এ বিধানটি রাসূলের ইন্তিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল না। বর্ণিত আছে, ইন্তিকালের পূর্বে ভীষণ অসুস্থাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে একদিন মসজিদে গমন করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে পূর্ব হতেই হযরত আবূ বকর রা. নামাযে ইমামতি করছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে হযরত আবূ বকর রা. এর ডান পার্শ্বে বসে পড়লেন।

فكان ابو بكر يصلى قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا يقتدى ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة ابي بكر.

হযরত আবূ বকর রা. দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায আদায় করছিলেন। হযরত আবূ বকর রা. নবীজীর নামাযের ইক্তিদা করছিলেন আর লোকেরা হযরত আবূ বকরের নামাযের ইক্তিদা করছিল। (বুখারী শরীফ হা. ৭১৩, মুসলিম শরীফ হা. ৪১৮)

বোঝা গেল, পূর্বের হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বসা ইমামের পেছনে ইক্তিদার আলোচনা বুখারী শরীফের ৪-৫ টি হাদীসে থাকা সত্ত্বেও তাকে সুন্নাহ বলে আমল করা যাবে না। কেননা তা নবীজীর ইন্তিকালের পূর্বে রহিত হয়ে গিয়েছে। এ জন্যই দেখা যাচ্ছে, তার ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে বসা ইমামের পেছনে দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তিগণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। আর এই ঘটনাও বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের কিতাবে লেখা থাকলেই কোনো হাদীসের উপর আমল শুরু করে দেয়া যাবে না। বরং দেখতে হবে সেটা সুন্নাহ পর্যায়ে পৌঁছেছে কি না। না পৌঁছলে সে হাদীসের উপর আমল করা জায়েয হবে না। এজন্যই হাদীসের সংকলক মুহাদ্দিসগণ মাযহাব মানা বাদ দিয়ে নিজের জমাকৃত সকল হাদীসের উপর আমল করেননি বা অন্যদেরকে ঢালাওভাবে আমল করতে বলেননি। (ইলমী খুতুবাত ১/৬২)

হাদীসের কিতাবে সকল হাদীসের উপর আমল করতে বলা হয়নি

সংকলকের নিজস্ব রুচি ও শর্ত অনুযায়ী হাদীসের কিতাবসমূহে নবুওয়াতের তেইশ বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর ইসলাম একদিনেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি, ধাপে ধাপে বহু বছরে তা পূর্ণতা পেয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রথম দিকের বহু বিধান পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। দ্বীনের সকল বিষয় সংরক্ষণের স্বার্থে সনদ সহীহ হওয়ার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসীনে কেরাম এসব রহিত বিধানের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলোও তাদের কিতাবে সংকলন করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর আমল করা জায়েয নেই। বরং যে হাদীসের বিধান নবীজীর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল কেবল তার উপরই আমল করতে হবে এবং সেটাকেই সুন্নাহ বলা হবে। এর বিপরীতে যে হাদীসের মধ্যে সুন্নাহ হওয়ার শর্ত পাওয়া যাবে না, হাদীস হিসেবে তাকে মাথার উপরে রাখতে হবে বটে কিন্তু তার উপর আমল করা যাবে না। এ-ই কারণ যে, হক্বপন্থীগণ নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তারা নিজেদেরকে আহলুল হাদীস বলেন না। বরং এটা একটা গলত ফেরকার নাম, যারা না বুঝে বা কোন প্রলোভনে পড়ে এ নাম গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, কোন্ হাদীসের মধ্যে শর্ত দুটি পাওয়া যাওয়ায় তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আর কোন্ হাদীস উক্ত শর্তদ্বয় থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে সুন্নাহ হয়নি বরং তা শুধু হাদীসই রয়ে গেছে তা সাধারণ মানুষ বুঝতে

সক্ষম নয়। এর জন্য বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া সকল মুসলমানের জন্য নেহায়েত জরুরি। তাই সাধারণ লোকদের জন্য বিজ্ঞ আলেমের সাহচর্য ছাড়া হাদীস গবেষণা করা মারাত্মক গোমরাহীর কারণ।

সারকথা হলো, প্রতিটি সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়। হ্যাঁ, অনেক হাদীসই শর্তসাপেক্ষে সুন্নাহর শামিল। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবসমূহের মধ্যে হাদীস ও সুন্নাহ মিশ্রভাবে সংকলিত হয়েছে। নবুওয়াতের ২৩ বছরে যা কিছু ঘটেছে বর্ণনাসূত্র সহীহ হলেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম তা কিতাবে স্থান দিয়েছেন। তারা হাদীস ও সুন্নাহকে পৃথকভাবে লিখে যাননি। অর্থাৎ বুখারী শরীফে, মুসলিম শরীফে হাদীসও আছে সুন্নাহও আছে। অন্যদিকে এমন কিছু হাদীসের কিতাবও সংকলন করা হয়েছে যেগুলোতে শুধুমাত্র সুন্নাহ অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ. সংকলিত কিতাবুল আসার, ইমাম মালেক রহ. সংকলিত মুআত্তা, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কিতাবুল উম্ম এ ক্ষেত্রে অন্যতম। আমাদের নিকট অতীতের আকাবিরদের মধ্যে হযরত থানবী রহ. এর তত্ত্বাবধানে যফর আহমদ উসমানী রহ. এর লেখা ইলাউসসুনান, আল্লামা নিমাবী রহ. এর লিখিত আসারুসসুনান ইত্যাদি কিতাব শুধুমাত্র সুন্নাহ এর সংকলন।

যাহোক সুন্নাহ ও হাদীসের আলোচ্য পার্থক্য না বোঝার কারণে, হাদীস মানার দাবীদারগণ নিজেরা ধোঁকায় পড়েছেন এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করছেন। কাজেই সর্বসাধারণের জন্য বুখারী মুসলিম ইত্যাদি কিতাব বা কিতাবের বাংলা অনুবাদ দেখে আমল করা উচিত নয়। কেননা কোন হাদীস রহিত হয়ে গেছে আর কোনটা বহাল আছে বা কোনটা শুধু হাদীস আর কোনটা হাদীস হওয়ার সাথে সাথে সুন্নাহ এ পার্থক্য জানা না থাকার কারণে তার গোমরাহ হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত তাবেঈ হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,‘সরাসরি হাদীস সাধারণের জন্য গোমরাহকারী, তবে বিজ্ঞ আলেমের জন্য অসুবিধা নেই।’ এ জন্য জনসাধারণের কর্তব্য হলো, শরী‘আতের যে কোনো হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে হক্কানী আলেম-উলামার শরণাপন্ন হওয়া। এবং নিজের রিসার্চ ও গবেষণার উপর আমল না করে তাদের ফায়সালা অনুযায়ী আমল করা। এটা নিরাপদ রাস্তা ও নির্ভেজাল শরী‘আত।

সুন্নাহ ও ফিকহ এক ও অভিন্ন জিনিসঃ

এখন আমরা সুন্নাহ এবং ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। বস্তুতঃ সুন্নাহ ও ফিকহ একই জিনিস। যদিও হাদীস আর ফিকহ এক নয়। সুন্নাহ মানে হলো, যার মধ্যে সনদ অর্থাৎ বর্ণনাসূত্র থাকার পাশাপাশি দু‘টি শর্ত বিদ্যমান রয়েছে এক. নবীজী صلى الله عليه وسلم তা উম্মতের আমলের জন্য

বলেছেন। দুই. তার মৃত্যু পর্যন্ত এ বিধান বহাল ছিল। আর সুন্নাহকে যদি বর্ণনাসুত্র বাদ দিয়ে পেশ করা হয়, তাহলে বর্ণনাসূত্র উল্লেখ বিহীন এই সুন্নাহর নামই হবে ফিকহ। সুতরাং সুন্নাহ আর ফিকহ একই জিনিস হলো। বোঝা গেল আহলে হাদীস ভাইয়েরা যে বলে, আমরা হাদীস মানি কিন্তু আবূ হানীফার ফিকহ মানি না, এটা নিতান্তই ভুল। কারণ ফিকহ আর সুন্নাহ তো একই জিনিস। কেউ ফিকহ না মানলে সুন্নাহও মানে না। আর যে সুন্নাহ মানে না সে হাদীস মানে না। আর যে হাদীস মানে না সে কুরআন মানে না। কারণ নবীজীকে অর্থাৎ তার হাদীসকে মানতে বলা হয়েছে (যে হাদীস সুন্নাহ পর্যায়ের)। ফিকহ না মানলে প্রকারান্তরে সুন্নাহকে অস্বীকার করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। আর যে সুন্নাহ মানে না হাদীসে তার প্রতি কঠোর ধমকি এসেছে।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবীজী صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেছেন, 'ছয় ব্যক্তির উপর আমি লানত করেছি, আল্লাহ তা'আলা ও সকল নবীও লানত করেছেন, তাদের এক শ্রেণী হলো, যে আমার সুন্নাহকে তরক করে'। (তিরমিযী হা.২১৪৫)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাহকে তরক কর, তাহলে নিশ্চিত গোমরাহ হয়ে যাবে।' (মুসলিম শরীফ হা.২৫৭) সুতরাং ফিকহ অস্বীকার করলে সুন্নাহ অস্বীকার করা হবে, আর সুন্নাহ অস্বীকার করলে সে নিশ্চিত গোমরাহ হয়ে যায়। কারণ নবীজী صلى الله عليه وسلم সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সুন্নাহ মানতে বলেছেন। সকল ক্ষেত্রে হাদীস মানতে বলেননি। কয়েকটি প্রমাণ লক্ষ্য করুন।

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها

'তোমরা আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে।' (আবূ দাউদ হা.৪৬০৭)

من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة

'যে আমার কোনো সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করলো, সে আমাকে মুহাব্বত করলো, আর যে আমাকে মুহাব্বত করবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।' (তিরমিযী হা.২৬৭৮)

المتمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد.

'উম্মতের বিপর্যয়ের সময় যে আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে।' (মুজামুল আওসাত হা.৫৪১৪)

تمسك بسنة خير من احداث بدعة

'সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে রাখা বিদআত উদ্ভাবন করা থেকে উত্তম'। (মুসনাদে আহমাদ:৪/২০২)

من احيا سنة من سنتى قد اميتت بعدى فان له من الاجرمثل اجورمن عمل بها..

'আমার মৃত্যুর পর যে আমার কোনো সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করবে ঐ সুন্নাতের ওপর যারা আমল করবে সে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।' (তিরমিযী হা.২৬৭৭)

উদাহরণস্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো। দেখা যাচ্ছে এসব হাদীসে নবীজী صلى الله عليه وسلم আমাদেরকে সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, সুন্নাহ অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং সুন্নাহর বিপরীত আমলে ধমকির কথা বলছেন। কোথাও হাদীস মানতে বলেননি।

নির্দিষ্ট মাযহাব মানার শরয়ী বিধানঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون.

যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। (সূরা নাহল ৪৩)

الرحمن فاسئل به خبيرا. (سورة الفرقان)

তিনি রহমান। তাঁর মহিমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো এমন কাউকে যে জানে। (সূরা ফুরকান, ৫৯)

ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم.

তারা যদি ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা যারা আলেম তাদের কাছে নিয়ে যেত তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে যেত। (সূরা নিসা ৮৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

نعم الرجل الفقيه ان احتيج اليه نفع والا اغنى نفسه.

ফকীহ ব্যক্তি কতই না উত্তম, লোকেরা দ্বীনি ব্যাপারে তার মুখাপেক্ষী হলে তিনি তাদের উপকার করেন অন্যথায় নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখেন। (কানযুল উম্মাল হা.২৮৯০৭)

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল, কুরআন হাদীসে অনভিজ্ঞ সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হলো, বিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম জেনে জেনে সে অনুযায়ী আমল করবে। তাদের জন্য নিজেদের গবেষণার উপর আমল করার অনুমতি নেই। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যা বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না।

কুরআন হাদীসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে জেনে আমল করার এই যে পদ্ধতি, পরিভাষায় একে তাকলীদ বলা হয়। তাকলীদ দুই প্রকার। এক.তাকলীদে মুতলাক। স্বাধীনভাবে যখন যে মুজতাহিদকে ইচ্ছা মেনে চলা। দুই.সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদের মতানুযায়ী শরী'আতের উপর আমল করা।

যিনি মুজতাহিদ নন তার জন্য তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ নির্দিষ্ট এক ইমামের মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ ভীষণ আপত্তি তুলে থাকেন। এমনকি তারা এটাকে শিরক পর্যন্ত আখ্যা দিয়ে থাকেন। এজন্য তাকলীদে শাখসীর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাযহাব মানার হাকীকত

প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজের খেয়াল-খুশি মতো জীবন যাপন করা নিষিদ্ধ ও হারাম। কুরআন হাদীসে এ ব্যাপারে অসংখ্য বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে যে, দ্বীনী বিষয়াদিতে নিজ খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হারাম। সে মতে কোনো ব্যক্তি যদি স্বার্থ ও প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় অতঃপর স্বার্থের অনুকূলে দলিল খুঁজতে কুরআন হাদীস চষে বেড়ায়, তাহলে উক্ত চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির বিচারে সে প্রবৃত্তির অনুগামী বিবেচিত হবে, যদিও ঘটনাক্রমে তার কর্মকাণ্ডের সমর্থনে কুরআন হাদীসে কোনো বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়।

হাফেয ইবনে তাইমিয়্যা রহ. তার এক নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর উম্মতের ঐক্যমত উল্লেখ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাযহাবসমূহে দলীল খুঁজে বেড়ায় এবং সে অনুযায়ী আমল করে তা কোনো ইমামের মাযহাবের উপর চাপিয়ে দেয়, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী নয়; সে আসলে প্রবৃত্তির অনুগামী।

একেক মাসআলায় নিজের মন মতো একেক ইমামের দারস্থ হওয়ার আলোচনা শেষে তিনি লিখেছেন, 'এটা মেনে নেয়া যায় না।,

لان ذلك يفتح باب التلاعب ويفتح الذريعة الى ان يكون التحريم والتحليل بحسب الاهواء.

কেননা এই কর্মপদ্ধতি দ্বীনকে খেলনায় পরিণত করার দরজা খুলে দিবে এবং হালাল-হারাম নির্ধারণে প্রবৃত্তিকে ভিত্তি বানানোর উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২/২৪০)

মোটকথা, দ্বীনের ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ উম্মতের ঐক্যমতে হারাম। এদিকে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে জনসাধারণকে যদি প্রত্যেক মাসআলা নিজের পছন্দ মতে বিভিন্ন ইমামের মতানুযায়ী আমল করার ছাড়পত্র প্রদান করা হয় যে, তারা যখন

ইচ্ছা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অনুসরণ করবে আবার যখন ইচ্ছা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসরণ করবে; যখন ইচ্ছা ইমাম মালেক রহ.কে মেনে চলবে, আবার যখন ইচ্ছা ইমাম আহমদ কিংবা অন্য কাউকে মেনে চলবে তাহলে এর অনিবার্য পরিণতি তাই হবে যাকে হাফেয ইবনে তাইমিয়্যা রহ. উম্মতের ঐক্যমতে হারাম বলেছেন।

তো শরী'আতের এই বিশেষ কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে উম্মতের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত নিশ্চিত করতে নিরাপদ মনে করা হয়েছে যে, তাদের জন্য সমস্ত মাসআলায় নির্দিষ্ট একজন ইমামের তাকলীদকে ওয়াজিব করে দেয়া হবে।

মূল বিষয় হলো, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা, আর এর জন্য যেহেতু প্রবৃত্তিপূজার এই যুগে উম্মতকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দিয়ে নির্দিষ্ট এক ইমামের মাযহাব মানতে বাধ্য করার বিকল্প নেই, তাই মূল লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হওয়ায় তাকলীদে শাখসীকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। তাকলীদে শাখসীকে যদিও পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আইনত ওয়াজিব করা হয়েছে; কিন্তু এর মূল ভিত্তি নবীজীর জীবদ্দশায় তাঁরই হাতে স্থাপিত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় বিভিন্ন দেশ ও শহর-নগর বিজিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং সে দেশের অধিবাসীদেরকে গভর্নরদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উদাহরণতঃ নাজরান বিজয় হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে হাযম রা. কে সেখানের গভর্নর বানালেন। আর নাজরানবাসীকে বলে দিলেন, তারা যেন আমর ইবনে হাযমের কথা অনুযায়ী চলে। তো এটা কি নির্দিষ্ট ইমামের মতামত ও মাযহাবের অনুসরণ নয়? অনুরূপ ইয়ামান বিজয় হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবাল ও আবূ মুসা আশআরী রা. কে ইয়ামানের দুই অঞ্চলের গভর্নর করে পাঠালেন এবং ইয়ামানবাসীকে তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিলেন। কেননা সুদূর নাজরান আর ইয়ামান থেকে সেখানকার অধিবাসীদের মদীনায় এসে নবীজীর নিকট থেকে সব ব্যাপারে সরাসরি সমাধান নেয়া সম্ভব ছিলো না। এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে গভর্নরদের কথা অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন। এটা কি নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ নয়? এবং স্বয়ং নবীজীর জীবদ্দশায় তারই আদেশে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ নয়? এখানে কারও একথা বলার সুযোগ নেই যে, এসব এলাকার অধিবাসীরা তো গভর্নরদের নিজস্ব মতামত ও মাযহাব অনুসরণ করেননি বরং তারা তাদের নিকট থেকে শুনে শুনে কুরআন হাদীসের অনুসরণ করেছেন। কারণ ইয়ামান সফরের প্রাক্কালে নবীজীর এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মুআয বলেছিলেন, কোনো সমস্যার সমাধান কুরআনে

কিংবা হাদীসে না পেলে আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে ফায়সালা দেব। তো এই ফায়সালা তো তার নিজস্ব মতের ভিত্তিতেই দেয়া হতো। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ জবাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। যারা নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করাকে শিরক বলে থাকেন তাদের বক্তব্য অনুযায়ী নবীজী কি আহলে নাজরান ও ইয়ামানবাসীকে শিরক শিক্ষা দিয়েছিলেন? নাউযুবিল্লাহ!! শুধু নাজরান আর ইয়ামান কেন নবীজীর যুগে যতগুলো অঞ্চল বিজিত হয়েছে, সবখানেই তিনি এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন সে সব এলাকার বাসিন্দারা নিজ নিজ গভর্নরের ফিকহ ও ফাতাওয়ার কেমন কঠিন তাকলীদ করতেন নিম্নোক্ত বর্ণনায় তা লক্ষ্য করুন,

عن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ باليمن الى قوله فالقيت محبتي عليه فما فارقته حتى دفنته بالشام ثم نظرت الى افقه الناس بعده فاتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات.

আমর ইবনে মাইমুন বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. ইয়ামানে আগমন করলেন। আমি তাকে ভালোবাসলাম। আমি তাকে শামে দাফন করার আগ পর্যন্ত তার থেকে পৃথক হইনি। তারপর আমি মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহর সন্ধান করে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর দুয়ারে হাজির হলাম এবং তাঁর খিদমতে লেগে রইলাম। এক সময় তারও ইন্তিকাল হয়ে গেল। (আবূ দাউদ মুজতাবায়ী পৃ.৬৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশে প্রত্যেক শহরে এক একজন করে মুফতী নিয়োগ দেয়া হয়। মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মদীনায় হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সিরিয়ায় মুআয ইবনে জাবাল, ইয়ামানে আবূ মুসা আশআরী প্রমুখ মুফতী সাহাবীকে নিয়োগ দেয়া হয়। এসব শহরের অধিবাসীগণ নিজ নিজ মুফতী সাহাবীর ফাতাওয়া অনুসরণ করে চলতেন।

এসব শহরের লোকজন নিজ নিজ মুফতীর মাযহাবকে এত কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন যে, নিজেদের মুফতীকে ছেড়ে অন্য মুফতীর ফিকহ ও ফাতাওয়া মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। বুখারী শরীফের ১৭৫৮-১৭৫৯ নং হাদীস এর স্পষ্ট দলীল। সেখানে বিদায় তাওয়াফের পূর্বে হায়েয শুরু হওয়া মদীনার এক মহিলা হজ্জযাত্রীর কথা আলোচিত হয়েছে। সমস্যার সমাধানে মদীনার লোকজন মক্কার মুফতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর ফাতাওয়া মদীনার মুফতী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর ফাতাওয়ার বিপরীত হওয়ায় মানতে রাজি হননি। যদিও তাহকীকের পর মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চার মাযহাবের ইমামগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাতাওয়া ও সুন্নাহ এবং মুফতী সাহাবীদের ফাতাওয়াসমূহ একত্রিত করে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনের উপর আমল করা সহজ করে দিয়েছেন। কোনো ইমামই

মনগড়া কথা বলেননি, তাদের প্রত্যেক মতামতের পেছনে অবশ্যই শরী'আতের দলীল চতুষ্টয়ের কোনো না কোনো দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

যা হোক উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হলো, স্বয়ং নবীযুগে এবং পরবর্তীতে সাহাবা যুগেও তাকলীদে শাখসী ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিল। তবে সেটা কল্যাণযুগ হওয়ায়, মানুষের মধ্যে দিয়ানতদারী ও বিশ্বস্ততা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকায় এবং জনসাধারণ প্রবৃত্তির অনুসারী ও আত্মপূজারী না হওয়ায় নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণকে তখন আইনত ওয়াজিব করা হয়নি। যদিও কার্যত প্রায় সব শহরেই এর প্রচলন ছিল। তারপর যখন ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, খেয়ানত ও প্রবৃত্তিপূজার অবস্থা পরিলক্ষিত হলো, দেখা গেল লোকেরা আইম্মায়ে কেরামের মতপার্থক্যকে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তখন দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী উলামায়ে কেরাম আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সংকলিত মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো এক মাযহাব অনুযায়ী শরী'আতের উপর আমল করাকে তাদের জন্য আইনত ওয়াজিব করে দিলেন। এটা ছিল মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহতা'আলা কুদরতীভাবে এ ব্যবস্থা না করলে আমাদের জন্য দ্বীন পালন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যেত।

আজকের এই প্রবৃত্তিপূজার রমরমা বাজারে সকল প্রকার হীনস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কেউ যদি খালেস দ্বীন ইসলামের উপর আমল করতে চায়, নিজেকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে চায় তার জন্য মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই। কেউ যদি হঠকারিতা বশতঃ এ ওয়াজিব কর্তব্যকে পিছনে ঠেলে দেয়, নিজের মনমত বল্গাহীনভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের দুঃসাহস দেখায় তাহলে ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্যের আলোকে বলতে হয়, সে আসলে সীরাতে মুস্তাকীমের অভিযাত্রী নয়; তার চলাফেলা ভয়ঙ্কর অন্ধগলিতে ও ধ্বংসের চোরাবালিতে।

এবার আমরা মাযহাব অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার উপর আকাবিরদের কয়েকটি ফাতাওয়া উল্লেখ করব।

১. প্রশ্ন : কোনো নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা সাধারণ মুসলমানের জন্য ফরয, ওয়াজিব না মুবাহ?

উত্তরঃ মুতলাক তাকলীদ ফরয। আর তাকলীদে শাখসীর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের মতে ওয়াজিব। (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/১২১)

২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (হাদীস শাস্ত্রে যার পাণ্ডিত্যের উপর আহলে হাদীসদের ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন) বলেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পর জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ

ইমামের মাযহাবের পাবন্দী অর্থাৎ তাকলীদে শাখসী শুরু হয়ে যায়। আর বর্তমান যুগে এটাই ওয়াজিব। (আল ইনসাফ পৃ. ৫৯)

৩. প্রশ্নঃ তাকলীদে শাখসী ওয়াজিব না ফরয?

উত্তরঃ তাকলীদে শাখসী ওয়াজিব। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৪/৩৫২)

৪. মূলনীতি হলো, ওয়াজিব কাজ সম্পাদনের জরুরী মাধ্যমগুলোও ওয়াজিব হয়, সে হিসেবে তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব অনুসরণ করাও ওয়াজিব হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ১/৪১৪)

৫. প্রশ্নঃ বর্তমানকালে যারা ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো একজনেরও তাকলীদ করে না তাদের বিধান কী?

উত্তরঃ বর্তমান যুগে যারা চার ইমামের কোনো একজনেরও তাকলীদ করে না তারা ফাসেক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের গণ্ডিবহির্ভূত। হারামাইন শরীফাইনের ফাতাওয়া অনুযায়ী তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব। (মাজমুআয়ে রাসায়েল ১/২৮)

মাযহাব না মানলে হাদীসের উপরও পুরোপুরি আমল করা সম্ভব নয়

আহলে হদীস ভাইয়েরা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাযহাব অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের কোনো তোয়াক্কা করেন না। তারা নিজেদের বুঝ-বুদ্ধি মাফিক সরাসরি হাদীসের উপর আমল করার দাবি করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, একজন অমুজতাহিদের পক্ষে মাযহাব না মেনে কিছুতেই হাদীসের উপর পূর্ণভাবে আমল করা সম্ভব নয়। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাকঃ

১.জামাআতে নামায আদায়কারী মুসল্লীদের পরস্পরের পা কিভাবে থাকবে?

এ ব্যাপারে হাদীসের কিতাবসমূহে কয়েক ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. عن أنس وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

অর্থ 'হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নামাযে আমাদের প্রত্যেকে তার কাঁধ পাশের ব্যক্তির কাঁধের সাথে মিলিয়ে রাখত এবং পা পাশের ব্যক্তির পায়ের সাথে মিলিয়ে রাখতো। (বুখারী হা.৭২৫) এই হাদীস দ্বারা বাহ্যত মনে হচ্ছে উভয় মুসল্লীর পা মিলানো থাকবে।

খ.

قَالَ رسول لله صلى الله عليه وسلم :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

অর্থ: তোমরা নামাযে তোমাদের ডান পায়ের পাশে জুতা রাখবে না। (কারণ সেখানে ফেরেশতা থাকে) এবং তোমাদের বাম পায়ের পাশেও রাখবে না। কারণ সেটা অন্য ভাইয়ের ডান পাশ। (আবূ দাউদ হা.৬৫৪)

এই হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যাচ্ছে, দুই মুসল্লীর পায়ের মাঝখানে ফাঁকা থাকবে। যেখানে জুতা রাখা সম্ভব। কিন্তু নবীজী صلى الله عليه وسلم সেখানে জুতা রাখতে নিষেধ করেছেন। দুজনের পায়ের মাঝখানে যদি ফাঁকাই না থাকে তাহলে তো জুতা রাখতে নিষেধ করার কোনো মানে হয় না।

উক্ত দুই হাদীসের বাহ্য বিরোধ লক্ষ্য করে আহলে হাদীস ভাইয়েরা দ্বিতীয় হাদীসের ওপর আমল করা ত্যাগ করেছেন এবং হাদীসটিকে একপ্রকার অস্বীকার করেছেন। কিন্তু যারা মাযহাব মানেন বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ নিজেদের ইমামের মাযহাব অর্থাৎ ব্যাখ্যা অনুযায়ী (ফাতা হিন্দিয়া:১/৭৩) উভয় মুসল্লীর পায়ের মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখেন। এতে উভয় হাদীসের উপর তাদের আমল হয়ে যায়। দ্বিতীয় হাদীসের ওপর আমল হয় সরাসরি ও প্রতক্ষ্যভাবে আর প্রথম হাদীসের ওপর আমল হয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষে পরোক্ষভাবে। তা এ ভাবে যে, মুহাক্কিক আলেমগণ বলেছেন, প্রথম হাদীসের يلزق শব্দ থেকে উভয় মুসল্লীর পা মিলিয়ে রাখার যে অর্থ বাহ্যত বুঝে আসে হাদীসে তা বুঝানো হয়নি। কেননা ‘এলযাক, শব্দের বাহ্যিক অর্থ মিলানো হলেও এখানে তা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে তখন স্বয়ং প্রথম হাদীসের উপরই আমল করা সম্ভব হবে না। দেখুন না, হাদীসে মুসল্লীদের পরস্পরে কাঁধ ও পা মিলিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে, অথচ মুসল্লীদের পরস্পরে পায়ে পা মিলিয়ে রেখে একই সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশ্বাস না হলে পাশাপাশি পাঁচজন লোক নিজ নিজ পায়ের মাঝে এক বিঘতের বেশি ফাঁকা রেখে (যেমনটি আহলে হাদীসের ভাইয়েরা করে থাকেন) তারপর পাশের জনের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিন এবং এ অবস্থায় সকলেই পরস্পপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। বিশেষতঃ মুসল্লীগণ যদি দৈর্ঘ্যে কমবেশি হয়ে থাকেন। যদি বলা হয় পা মিলিয়ে রাখলেই হবে কাঁধ মিলানো জরুরী নয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা একই হাদীসে বর্ণিত একই ধরনের দুটি বিধানের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে আঁকড়ে ধরা কিংবা একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার গ্রহণযোগ্যতা নেই। তা ছাড়া আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত (হাদীস নং হা.৬৬২) নুমান ইবনে বশীর রাযি. থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.

অর্থ: আমি দেখেছি লোকেরা নামাযে তার কাঁধ পার্শ্ববর্তীর কাঁধের সাথে তার হাঁটু পার্শ্ববর্তীর হাঁটুর সাথে আর টাখনু টাখনুর সাথে মিলিয়ে রাখতো’।

পাঠক ! হাঁটুর সাথে হাঁটু রাখতে হলে তো দুজন ব্যক্তিকে মুখোমুখি বসে তবে কাজটি করতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় এটা বিলকুল অসম্ভব। যা হোক, রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে এই যে এতগুলো অসংগতি সৃষ্টি হচ্ছে, তা মূলত ‘এলযাক, শব্দটিকে মিলানো অর্থে ব্যবহার করার কারণে। সুতরাং বাধ্য হয়েই শব্দটিকে কাছাকাছি, পাশাপাশি, সমান ও সমান্তরাল অর্থে ব্যবহার করতে হবে। যেমনঃ আরবী ভাষায় مررت بزيد বাক্যটির ب বর্ণের মূল অর্থ মিলানো হলেও অর্থ করা হয়, আমি যায়েদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি। এখানে কেউ এ অর্থ করে না যে, আমি যায়েদের শরীরের সাথে শরীর মিলিয়ে তাকে অতিক্রম করেছি। সুতরাং হাদীসে يلزق শব্দটিকে মিলানো অর্থে আতিশয্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেন কেউ কাতারের মাঝখানে অযথা ফাঁকা না রাখে। কিংবা হাদীসে কাতার সোজা করার সময় পা, কাঁধ মিলিয়ে মিলিয়ে কাতার সোজা করার কথা বলা হয়েছে। কাতার সোজা হওয়ার পর নামাযের মধ্যেও তা ধরে রাখতে হবে সেটা বলা হয়নি। নচেৎ সেজদা থেকে পরবর্তী রাকাআতের জন্য উঠে মুসল্লীকে আবার তার পার্শ্ববর্তীর পা খুঁজে বের করে তার সাথে নিজের পা মিলাতে হবে। যা নিঃসন্দেহে নামাযের একাগ্রতা বিনষ্টকারী হওয়ায় মাকরুহ বলে গণ্য হবে।

মোদ্দাকথা, এতসব বিষয় বিবেচনা করে ইমাম আবূ হানীফা রাহ. দ্বিতীয় হাদীসের ওপর সরাসরি আমল করার কথা বলেছেন। আর প্রথম হাদীসের يلزق শব্দটির ব্যাখ্যাসাপেক্ষে সেটার ওপরও আমল করেছেন। এটাই হানাফীদের মাযহাব। এর দ্বারা এ সংক্রান্ত সকল হাদীসের উপর আমল হয়ে যাচ্ছে। চাই তা সহীহ, যয়ীফ যাই হোক না কেন। সাথে সাথে মুসল্লীগণ নামাযে একাগ্রতাও ধরে রাখতে পারছেন। যেটা নামাযের অন্যতম কাম্য বিষয়। এখন বলুন, বুখারী, মুসলিমে নেই কিংবা আমাদের তাহকীক (?) অনুযায়ী সহীহ নয় এই ধুঁয়া তুলে এক হাদীসের অর্ধেকের ওপর আমল করা উচিত, না এমনভাবে আমল করা উচিত যাতে সকল হাদীসের বাহ্যবিরোধ শেষ হয়ে সবগুলোর উপর একই সঙ্গে আমল হয়ে যায়? তবে হাদীসের এসব সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয় অনুধাবনের জন্য সতেজ ও সজীব মস্তিষ্কের প্রয়োজন। ভারবাহী প্রাণীবিশেষের মেজাজ নিয়ে তা সম্ভব নয়।

২.তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযী তার হাত কতটুকু উপরে উঠাবে এ বিষয়ক কয়েকটি রেওয়ায়েত দেখুন।

ক.

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة.

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী صلى الله عليه وسلم যখন নামায শুরু করতেন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।’ (বুখারী হা.৭৩৫, মুসলিম হা.২২,৩৯০)

জানা গেল, তাকবীরে তাহরীমার সময় মুসল্লী হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

খ.

عن مالك بن حويرث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما اذنيه- وفى رواية حتى يحاذى بهما فروع اذنيه.

অর্থঃ হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী صلى الله عليه وسلم যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় হাত কানের উপরের অংশ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী হা.৭৩৭, মুসলিম হা.২৫,৩৯১) এ হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে, মুসল্লীগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কান বরাবর উঠাবে। দুটি হাদীসই বুখারী, মুসলিমে এসেছে এবং বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। সাহাবায়ে কেরামসহ যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণ দুই হাদীসের সমন্বয়ে বলেছেন, কাঁধ বরাবর হাত উঠানোর হাদীসটি মহিলা নামাযীর জন্য, এটা তাদের পর্দার বিধানের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর কান বরাবর হাত উঠানোর হাদীসটি পুরুষ নামাযীর জন্য। তাদের গঠন প্রকৃতি হিসাবে এটাই মানানসই।

লক্ষ্য করুন, যদি এখানে পুরুষদের জন্য দ্বিতীয় হাদীসটি মা'মূল বিহি বা আমলযোগ্য সাব্যস্ত করা হলো, কিন্তু তাদের এই আমলের মাধ্যমে প্রথম হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাচ্ছে। কেননা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে তো কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেই হয়। আবূ দাউদ শরীফের একটি হাদীস যদিও তা বুখারী, মুসলিমের রেওয়ায়েতের সমতুল্য নয় কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যাকে দারুনভাবে সমর্থন করছে।

عَنْ وائل بن حجر أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

অর্থঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি নবিজী صلى الله عليه وسلم কে দেখেছেন, যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন দুই হাত এমনভাবে উঠাতেন যে, তা কাঁধ বরাবর হয়ে যেত আর তার বৃদ্ধাঙ্গুল দুটি কান বরাবর হয়ে যেত। তার পর তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।' (আবূ দাউদ হা.৭২৪)

এখন কেউ যদি আহলুল হাদীস বন্ধুদের কথামত কাঁধ বরাবর হাত তুলেন তাহলে স্বয়ং বুখারী, মুসলিমেরই এক হাদীসের উপর আমল করা হবে আর অপর হাদীস প্রত্যাখ্যাণ করা হবে। তাহলে বলুন, হাদীস মানতে হলে মাযহাব মানার কোনো বিকল্প আছে কি?

৩. তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত কোথায় বাঁধবেঃ

দুটি হাদীস লক্ষ্য করুন,

ক.

عن طاؤس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلاة.

অর্থ: হযরত তাউস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী صلى الله عليه وسلم নামাযে ডান হাতকে বাঁ হাতের উপর রেখে বুকের উপর শক্ত করে বাঁধতেন।' (আবূ দাউদ হা.৭৫৯) এ হাদীসকে সঠিক ধরা হলে, বাহ্যত মনে হয় তাকবীরে তাহরীমা বলার পর মুসল্লীদের হাত বুকের উপর থাকবে।

খ.

عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبى الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة.

অর্থ: 'হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. বর্ণণা করেছেন, আমি নবীজীকে নামাযে ডান হাতকে বাঁ হাতের উপর নাভির নিচে বাঁধতে দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:১/৩৪২)

গ.

عن حجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلز او قال سألته قال كيف يصنع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله يجعلها اسفل من السرة.

অর্থ: 'হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাস্সান থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ মিজলায থেকে শুনেছেন অথবা তাকে প্রশ্ন করেছেন, নামাযে হাত কীভাবে বাঁধতে হবে? তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের উপর নাভির নিচে রাখবে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.৩৯৪২)

ঘ.

عن على قال ان من السنة فى الصلوة وضع الاكف على الاكف تحت السرة.

অর্থ: 'হযরত আলী রাযি. বলেছেন, নামাযে নবীজীর সুন্নাত হলো, ডান হাতকে বাঁ হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।' (আবূ দাউদ হা.৭৫৬)

এই সকল হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমার পর নামাযী হাত নাভির নিচে বাঁধবে। বাহ্যতঃ প্রথম হাদীস এবং পরবর্তী হাদীস তিনটি পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু একজন ফকীহ ও মুজতাহিদের সূক্ষ্মদর্শিতা সহজেই এর রহস্য ভেদ করতে সক্ষম। তারা এই দুই প্রকার হাদীসের সমন্বয় সাধনে বলেছেন, বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসটি মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। কারণ এটা পর্দার অধিকতর নিকটবর্তী। আর দ্বিতীয় হাদীসটি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য, তাদের গঠন আকৃতির ভিত্তিতে এটাই মুনাসিব। তো এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে উভয় হাদীসের উপরই আমল হয়ে গেল। অথবা প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, শুধুমাত্র

বৈধতা বুঝানোর জন্য নবীজী صلى الله عليه وسلم কখনো কখনো বুকের উপর হাত বাঁধতেন। তবে তার আসল আমল ছিল নাভির নিচে হাত বাঁধা। যেটা দ্বিতীয় হাদীসে এবং হযরত আলী রাযি. ও আবূ মিজলাযের হাদীসে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আহলুল হাদীস বন্ধুদের কথা মত যদি শুধু বুকের উপর হাত রাখার হাদীসকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলো আমলবিহীন থেকে যাবে। বরং এ আমলটিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা হবে। পক্ষান্তরে ফুকাহায়ে কেরামের মতটি গ্রহণ করলে, নবীজী صلى الله عليه وسلم এর উভয় প্রকার আমলই যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষিত রইল। এ হিসাবে প্রকৃত আহলুস সুন্নাহ হলো, ফুকাহায়ে কেরাম ও তাদের মাযহাব অনুসারীগণ।

৪. নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান:

নিম্নের বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করুন:

ক.

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

অর্থ: ‘হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বলেন, নবীজী صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না।’ (বুখারী হা. ৭৫৬, মুসলিম হা.৩৪,৩৯৪)

খ.

عن ابى هريرة وقتادة: واذا قرأ فانصتوا.

অর্থঃ যখন ইমাম সূরা কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক।’ (মুসলিম হা.৬৩,৪০৪)

গ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة.

অর্থ: নবীজী صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেন, যে মুসল্লীর ইমাম রয়েছে তার ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।’ (মুআত্তা ইমাম মালেক হা.৬২,৬৩)

প্রথম হাদীস থেকে জানা গেল, নামায সহীহ হওয়ার জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী। দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সূরা কিরাআত পড়াকালীন মুক্তাদিদের জন্য চুপ থাকাই হলো ইমামের অনুসরণ করা। তাহলে প্রথম হাদীসে বর্ণিত সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপক বিধান থেকে দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা মুক্তাদীর বিধান পৃথক হয়ে গেল। অর্থাৎ ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে আর কিরাআত পড়তে হবে না। চাই তা সূরা ফাতিহা হোক বা অন্য কোনো সূরাই হোক। এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃতীয় হাদীসটি । যেখানে বলা হয়েছে, যার ইমাম আছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু সূরা

ফাতিহাও কিরাআতের অর্ন্তভুক্ত তাই তাকে আর আলাদা করে সূরা ফাতিহাও পড়তে হবে না। বরং ইমামের ফাতিহাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। হাদীস অনুসরণের দাবীদার বন্ধুরা শুধুমাত্র প্রথম হাদীসটি গ্রহণ করে ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন। আর অপর দুই হাদীসকে বিলকুল ছেড়ে দিয়েছেন। এটা হাদীসের প্রতি অবজ্ঞা, দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে মাযহাবের ইমামগণ নবীজী صلى الله عليه وسلم এর প্রতিটি আমল সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। তারা চেয়েছেন, একান্ত জাল ও বানোয়াট না হলে বাহ্য বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলো দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হলেও সেগুলোর মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা যাতে কোনো না কোনো পর্যায়ে সকল হাদীসই উম্মতের মধ্যে কার্যতঃ যিন্দা থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত মাকবূলিয়্যাতের ফলে তারা সেই চেষ্টায় সফলও হয়েছেন। আর উম্মতে মুসলিমাও তাদের কথা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করছেন।

৫. সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার পদ্ধতিঃ

ক.

عن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين ومد بها صوته.

অর্থ: ‘হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী صلى الله عليه وسلم কে غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়তে শুনেছি। তারপর তিনি আমীন বলেছেন। আর শব্দটিকে তিনি টেনে দীর্ঘ করে বলেছেন। (তিরমিযী হা.২৪৮, আবূ দাউদ হা.৯৩২)

এই হাদীস থেকে কেউ কেউ উচ্চ স্বরে আমীন বলার বিধান বের করেছেন। যদিও “মাদ্দা” শব্দের অর্থ উচ্চ আওয়াজ নয়। বরং এর অর্থ হলো, দীর্ঘ স্বরে টেনে পড়া।

খ.

عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين يخفض بها صوته.

সেই পূর্বোক্ত সাহাবী হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি নবীজী صلى الله عليه وسلم এর সঙ্গে নামায আদায় করলেন, নবীজী صلى الله عليه وسلم যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়লেন, তখন অনুচ্চ স্বরে আমীন বললেন। (মুসতাদরাকে হাকেম হা.২৯১৩)

পূর্বোক্ত দুটি হাদীসই হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত। প্রথম হাদীসে তিনি দীর্ঘ স্বরে আমীন বলার কথা উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসে

তা অনুচ্চস্বরে বলার বর্ণনা দিয়েছেন। এই উভয় বর্ণনা মিলে অর্থ দাঁড়ালো, নবীজী صلى الله عليه وسلم আমীন শব্দটিকে দীর্ঘ স্বরে অনুচ্চ আওয়াজে পড়তেন। আর এই উভয় কথার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ একটি শব্দকে অনুচ্চ আওয়াযে টেনে পড়া বিলকুল সম্ভব। এটাই হানাফীদের আমল। তারা আমীনকে অনুচ্চ স্বরে টেনে টেনে পড়েন। আর যদি মাদ্দা এর অর্থ উচ্চ স্বর বলা হয়, যেমনটি আহলুল হাদীস ভাইয়েরা বুঝেছেন, তাহলে উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, নবীজী صلى الله عليه وسلم উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সূরা ফাতিহার শেষে কখনো কখনো হালকা আওয়াজে আমীন পড়েছেন। এটাই ফুকাহাদের ব্যাখ্যা যা যুক্তিগ্রাহ্য।

কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের মতানুযায়ী যদি সজোরে আমীন বলার হাদীস গ্রহণ করা হয়, তাহলে আস্তে আমীন বলার হাদীস যেটা নবীজী صلى الله عليه وسلم এর স্থায়ী আমল ছিল তাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ফলে হাদীসের আংশিক মেনে বাকিগুলোকে অস্বীকার করা হয়। এটাতো হাদীস মানা নয়। হাদীস মানার নামে হাদীস নিয়ে তামাশার নামান্তর এবং অসংখ্য হাদীস অস্বীকার করে দ্বীন ও ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জঘন্য পথ অবলম্বন। এ ধ্বংসাত্মক পথ থেকে আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

মাযহাবের বিভিন্নতা ও তাকলীদের হাকীকত

সম্প্রতি ‘আহলে হাদীস’ বন্ধুরা মাযহাব ও তাকলীদ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠিয়েছেন। মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করছেন। হাদীস মানার কথা বলে এবং বড় বড় কয়েকজন ইমামের উক্তির অপব্যবহার করে মুসলমানদেরকে মাযহাব ও তাকলীদের গণ্ডি থেকে বের করে আনছেন। ইতোমধ্যে অনেক মুসলমান তাদের ধোঁকার শিকার হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মাযহাব ও তাকলীদের হাকীকত ও স্বরূপ মুসলমান ভাইদের সামনে তুলে ধরা জরুরী হয়ে পড়েছে, যেন মুসলমান ভাইয়েরা মূল বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং তথাকথিত আহলে হাদীস বন্ধুদের ধোঁকার শিকার না হয়।

মাযহাবের বিভিন্নতার কারণ

ইসলামের উৎস মূল কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন শরীফের ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশ আয়াতের মধ্য থেকে মাত্র পাঁচশত আয়াত শরী‘আতের হুকুম সম্পর্কীয়। আর হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য থেকে মাত্র তিন হাজার হাদীস ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কীয়। অথচ শরী‘আতের মাসআলা মাসাইলের সংখ্যা লক্ষাধিক। তাই সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর সমাধান সবিস্তার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এখানে সামান্য কিছু হুকুম-আহকাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর

বাকিগুলো মূলনীতি আকারে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। এই মূলনীতির আলোকে ইসলামী শরী‘আতের বড় বড় আলেমগণ যাদেরকে আমরা মুজতাহিদ বলে থাকি তারা মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত সমস্যার সমাধান সবিস্তার সংকলন করে গেছেন। যারা সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ ইসলামী শরী‘আতের উৎস মূল কুরআন-সুন্নাহ পড়তে জানে না, পড়তে জানলেও অর্থ জানে না, অর্থ জানলেও মর্ম বোঝে না, মর্ম বুঝলেও কুরআন-সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে মাসআলা-মাসায়েল বের করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ হলো ‘তোমরা না জানলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও’। (সূরা: নাহল:৪৩, আম্বিয়া:৭)

এককথায় বলা যায়, এমন মুসলমান যারা মুজতাহিদ নয় (সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে যে কোনো সমস্যার সমাধান বের করতে পারে না) তারা মুজতাহিদগণের অনুসরণ করে চলবে। এটাই আল্লাহ তা‘আলার হুকুম। আর এমন মুজতাহিদ যারা মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত অধ্যায়ের সমস্যার সমাধান সংকলন করেছেন তারা চারজন। ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.।

সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগে এই চারজন ছাড়া আরো অনেক মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু তারা মানুষের জীবনের সমস্ত অধ্যায়ের সমাধান দিয়ে যাননি কিংবা তাদের সমাধানগুলি পরিপূর্ণরূপে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়নি। তাই এই চারজন মুজতাহিদ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের জীবন পরিচালনার যে সবিস্তার সমাধান সংকলন করে গেছেন যাকে এককথায় আমরা মাযহাব বলে থাকি, মুসলমানরা আজ অবধি তাই অনুসরণ করে আসছে। এক পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যে কোনো মুসলমানের জন্য এই চার মাযহাবের যে কোনো একটি অনুসরণ করা জরুরী। চার মাযহাব মূলত ইসলাম নামক বৃক্ষে আরোহণের চারটি সোপান। যে কেউ এই চার মাযহাবের যে কোনো একটি অনুসরণ করবে, সে পরকালে অবশ্যই মুক্তি পাবে। ইনশাআল্লাহ।

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত যে, ইসলামের মূল বিষয় অর্থাৎ ঈমান-আকীদা ও ফরয হুকুম-আহকাম নিয়ে চার মাযহাবের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। এ ব্যাপারে চারো মাযহাব এক। আর কুরআন-সুন্নাহের মধ্যে যে-সব হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতেও কোনো মতানৈক্য নেই। এসব ক্ষেত্রে চারও মাযহাবের হুকুমই এক ও অভিন্ন। ইখতিলাফ বা মতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে কেবল শাখা-গত বিষয়ে এবং ঐসব মাসাইলের মধ্যে যা কুরআন-সুন্নাহ এর মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি।

মাযহাব একাধিক হল কেন?

এখন প্রশ্ন মাযহাব একটি হলে তো হয়, মাযহাব একাধিক হল কেন? সব মুসলমান একই মাযহাবের অনুসারী হত এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও একতা ঠিক থাকতো।

এর জবাব হলো, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাই হয়তো এমন ছিল যে, মাযহাব একাধিক সৃষ্টি হোক। তাই তিনি কুরআনের শব্দগুলি এমনভাবে অবতীর্ণ করেছেন যে, সেখান থেকে একাধিক অর্থ বুঝার সুযোগ রেখে দিয়েছেন। এমনিভাবে নবীজী صلى الله عليه وسلم এর ইচ্ছাও এমন ছিল যে, একাধিক মাযহাব সৃষ্টি হোক। তাই অনেক হাদীসের শব্দ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখান থেকে একাধিক অর্থ নেওয়া যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

কুরআনের উদাহরণ

কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তা

মহিলাদের ইদ্দতের আলোচনায় বলেনঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন "কুরু" ইদ্দত পালন করবে'। (সূরা: বাকারা:২২৮) قُرُوء (কুরু) শব্দের অর্থ আরবী অভিধানে হায়েয ও পবিত্রতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরু শব্দের অর্থ যেমনিভাবে হায়েয হয় তেমনিভাবে পবিত্রতাও হয়। আর এই দুই অর্থের সমর্থনে হাদীসও পাওয়া যায়। যেমন হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, যায়েদ বিন সাবেতসহ আরো অনেক সাহাবি রাযি. থেকে কুরু শব্দের অর্থ পবিত্রতা বর্ণিত আছে। আবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ আরো অনেক সাহাবা রাযি. ও তাবেঈন থেকে কুরু এর অর্থ হায়েয বর্ণিত আছে। একই শব্দের বিপরীতমুখী অর্থের কারণে এখানে এই মাসআলায় দুই মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী কুরু এর অর্থ পবিত্রতা গ্রহণ করে বলেন, এমন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যে ঋতুবর্তী (গর্ভবতী নয়) সে তিন পবিত্রতা ইদ্দত পালন করবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও আহমাদ বিন হাম্বল রহ., কুরু এর অর্থ হায়েয গ্রহণ করে বলেছেন, ঋতুবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তিন হায়েয ইদ্দত পালন করবে। (বিস্তারিত জানতে তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:২২৮)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী, তাই তিনি অবশ্যই জানতেন যে, কুরআনের এই কুরু শব্দ নিয়ে একাধিক মত বা মাযহাব সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা যদি ইসলামী শরী'আতের মধ্যে একাধিক মাযহাবের সৃষ্টি না চাইতেন, তাহলে এখানে কুরু শব্দ ব্যবহার না করে তুহুর-হায়েয বা এ জাতীয় অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে একাধিক অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানা সত্ত্বেও তা করেননি। এর দ্বারা একথাই স্পষ্টভাবে

www.muslimdm.com

প্রমাণিত হয় যে, একাধিক মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হাদীসের একটি উদাহরণ

খন্দক যুদ্ধ চলাকালীন ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইযা মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে গাদ্দারী করে। তাই খন্দক যুদ্ধ শেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বনী কুরাইযার সাথে জিহাদ করার হুকুম আসে। হুকুম আসামাত্র নবীজী صلى الله عليه وسلم সাহাবা রাযি. কে খুব দ্রুত বনীকুরাইযার এলাকায় পৌঁছার হুকুম দেন। সেই হুকুমের শব্দটি ছিল এরূপঃ

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

'তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় পৌঁছার আগে আসরের নামায না পড়ে'। (বুখারী হা.নং ৩৮৩৯) এই নির্দেশ পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বনী কুরাইযা অভিমুখে নিজেদের সাধ্যমত দ্রুত ছুটলেন। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও আছরের ওয়াক্তের মধ্যে বনী কুরাইযায় পৌঁছতে পারলেন না। এদিকে পথিমধ্যেই আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার অবস্থা। তখন সাহাবা কেরাম রাযি. দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল নবীজী صلى الله عليه وسلم এর কথার বাহ্যিক অর্থ ধরে বললেন, যেহেতু নবীজী صلى الله عليه وسلم বনী কুরাইযায় না পৌঁছে আসর পড়তে নিষেধ করেছেন, তাই আমরা বনী কুরাইযায় পৌঁছেই মাগরিবের ওয়াক্তে আসর পড়ব। আরেক দল যারা নবীজী صلى الله عليه وسلم কথার মর্ম বুঝেছিলেন তাঁরা বললেন, নবীজী صلى الله عليه وسلم এর ঐ কথার উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বনী কুরাইযায় পৌঁছা। আমরা যেহেতু সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেও আসরের ওয়াক্তে বনী কুরাইযায় পৌঁছতে পারিনি, তাই আমরা আসর কাযা না করে এখনই আসর পড়ে তারপর বনী কুরাইযায় পৌঁছবো। উভয় দল নিজেদের মতানুযায়ী আমল করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন, বনী কুরাইযার যুদ্ধ শেষে যখন এই ঘটনা নবীজী صلى الله عليه وسلم কে বলা হলো, তখন তিনি কোনো দলের কাজকেই ঠিক বা ভুল বলেননি। (সহীহ বুখারী হা.নং ৩৮৩৯)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, নবীজী صلى الله عليه وسلم এর বাণী 'তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় পৌঁছার আগে আসরের নামায না পড়ে' এই বাণীর দুই রকম অর্থ সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন এবং দুই ভাবে আমলও করলেন। আর নবীজী صلى الله عليه وسلم ও কোনো দলের সিদ্ধান্তকে ঠিক আর কোনো দলের সিদ্ধান্তকে ভুল বললেন না। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীজী صلى الله عليه وسلم এর ইচ্ছাও এমন ছিল যে, শরী'আত মানার ক্ষেত্রে একাধিক মত ও পথ তৈরি হোক। কেননা যদি নবীজী صلى الله عليه وسلم এর ইচ্ছা এমনটি নাই হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামের দুই দলের এক দলকে বলতেন 'তোমাদের কাজ ঠিক হয়নি, তোমরা আমার কথা বুঝতে পারনি'। কিন্তু তিনি

www.muslimdm.com

এমনটি বলেননি। আর তিনি হুকুমটাও এমনভাবে করেছেন যে, তা থেকে দুই রকম অর্থ বোঝার সুযোগও ছিল। অথচ তিনি কথাটা ওভাবে না বলে এভাবেও বলতে পারতেন যাতে দুই রকম অর্থ বুঝার সম্ভাবনা সৃষ্টি হত না । যেমন তিনি এভাবে বলতে পারতেনঃ 'আসর কাযা করতে হলেও তোমরা বনী কুরাইযায় গিয়েই আসর পড়বে।' এভাবে বললে সাহাবা কেরাম দুই রকম অর্থ বুঝতেন না। আর দুই মতেরও সৃষ্টি হত না।

যাই হোক কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, শরী'আত মানার ক্ষেত্রে একাধিক মাযহাব সৃষ্টি হওয়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও নবীজী صلى الله عليه وسلم এর ইচ্ছা ছিল। তাই এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর যে, ইসলামে এত দল, এত মত কেন? সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহকে যে কোনো এক মত বা মাযহাবের উপর ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করাও আল্লাহ তা'আলার মর্জির খেলাফ। সালফে সালেহীন মাযহাবের এই ইখতিলাফকে রহমত বলে অভিহিত করেছেন। এবং তারা মুসলিম উম্মাহকে একই মাযহাবের উপর আমল করতে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করেছেন। নিম্নে এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

১. কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক রহ. বলেনঃ 'আমলের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের ইখতিলাফের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের কল্যাণ করেছেন। এখন যে কেউ কোনো আমল করতে চাইলে সে এ ব্যাপারে প্রশস্ত পথ পেয়ে যায়। সে দেখে যে, তার থেকে উত্তম ব্যক্তি এই আমল করে গেছেন।' (জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি:২/৮০)

২. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. বলেছেন: 'সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে ইখতিলাফ না হওয়াটা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, যদি ইখতিলাফ না হত, শরী'আত মানার পথ একটিই হত, তাহলে এর দ্বারা এক ধরণের সংকীর্ণতা সৃষ্টি হত। অথচ সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু প্রত্যেকেই অনুসরণীয় তাই (তাদের মধ্যে ইখতিলাফ হওয়ার ফলে এখন) যে কারো যে কোনো সাহাবীর মতানুযায়ী আমল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।'

৩. একদা হযরত ইমাম মালেক রহ. কে তখনকার মুসলিম জাহানের খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর বললেন, আমি চাচ্ছি আপনার সংকলিত এই ইলম (মুআত্তা মালেক) কে একমাত্র অনুসরণীয় করবো এবং সেনাবাহিনী ও বিচারক সবাইকে এই অনুযায়ী আমল করতে বলব। অতঃপর কেউ এটার বিরোধিতা করলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। ইমাম মালেক রহ. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! একটু ভেবে দেখুন। নবীজী صلى الله عليه وسلم এমন অবস্থায় উম্মতের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন যখন মাত্র কয়েকটি এলাকা ইসলামের অধিনে এসেছে। এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর সময়ও ইসলাম তেমন ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ

পায়নি। হযরত উমর ফারূক রাযি. এর সময় ইসলাম পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লো। অনেক দেশ মুসলমানদের করতলগত হল। তখন তিনি বিজিত এলাকার মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেসব এলাকায় ঐসব সাহাবায়ে কেরামের ইলম চর্চা হতে লাগল যাদেরকে ঐ এলাকার মুআল্লিম হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন আপনি যদি সেসব লোককে এমন কোনো বিষয় মানতে বাধ্য করেন যা তাদের নিকট সংরক্ষিত ইলমের পরিপন্থী, তাহলে তারা এটাকে কুফরী মনে করবে। অতএব, আপনি দয়া করে প্রত্যেক শরহবাসীকে তাদের নিকট যে ইলম সংরক্ষিত আছে, সে ইলম অনুযায়ী আমল করতে বলুন। আর আপনার পছন্দ হলে এই কিতাব আপনি নিজের জন্য নিতে পারেন। একথা শুনে খলীফা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই কিতাব আপনি আমার ছেলে মুহাম্মাদের জন্য লিখে দিন।' (আদাবুল ইখতিলাফ পৃ.৩৬)

৪. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ফুকাহা কেরামের ইখতিলাফ এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।' (আদাবুল ইখতিলাফ পৃ.৩৯)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, শরী'আত মানার ক্ষেত্রে একাধিক পথ সৃষ্টি হওয়া কোনো দোষণীয় বিষয় নয়। বরং এটা এই উম্মতের জন্য রহমত এবং এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অতএব, একাধিক মাযহাব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা এবং যে এলাকায় যে মাযহাব প্রচলিত আছে সেই এলাকার লোকদেরকে তাদের মাযহাব পরিপন্থী কোনো কিছু মানার আহ্বান করা কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনের আমলের পরিপন্থী। তাই যারা এ কাজ করছে, তাদের উচিত আরো একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা। তারা কি আসলেই মুসলিম উম্মাহর খায়েরখাহী করছে নাকি মুসলিম উম্মাহকে ফেতনা-ফাসাদ ও সংঘর্ষের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ইমাম মালেক রহ. নিজের মাযহাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়েও তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন না, বরং খলীফার কাছে আবেদন করলেন প্রত্যেক এলাকাবাসীকে নিজেরদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বর্তমানে যারা হানাফী মাযহাব মাননেওয়ালা মুসলিমদেরকে মাযহাব বিমুখ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তারা কি নিজেদেরকে ইমাম মালেক থেকেও বেশি সমঝদার মনে করেন যে, তারা হানাফী মুসলিমদেরকে নিজেদের মনগড়া মাযহাবের প্রতি আহ্বান করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলছেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

হানাফী মাযহাবের উৎসঃ

www.muslimdm.com

আজকাল অনেককে দেখা যায়, তারা হানাফী মাযহাব মাননেওয়ালা মুসলমানদেরকে বলছে 'তোমরা কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে ইমাম আবূ হানীফাকে মানছো। অতএব, তোমরা শিরক করছো।'

আমরা বলব, যারা হানাফী মাযহাব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ তাদের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব। যারা হানাফী মাযহাবের উৎস সম্পর্কে জানে তারা কখনোই এমন কথা বলতে পারে না। আমরা এখানে হানাফী মাযহাবের উৎস মূল অর্থাৎ হানাফী মাযহাব কোথা থেকে আসল, কীভাবে আসল, কীভাবে হানাফী মাযহাব সৃষ্টি হলো সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

সতের হিজরীতে হযরত উমর রাযি. কর্তৃক ইরাক বিজয় হলো। ইরাকে তিনি একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করলেন। শহরটির নাম রাখলেন 'কূফা'। এই নতুন শরহটি মূলত মুসলমানদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং ইরাকের প্রশাসনের কাজ এখান থেকেই পরিচালিত হত। হযরত উমর রাযি. বিজিত এলাকার জনগণকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন এলাকার মুআল্লিম করে পাঠাতেন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি.কে ইরাকের মুআল্লিম করে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. কূফা নগরীতে অবস্থান করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. নবীজী صلى الله عليه وسلم এর সফর-হযর সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন। তিনি নবীজী صلى الله عليه وسلم কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাই নবীজী صلى الله عليه وسلم এর কথা-কাজ খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। নবীজী صلى الله عليه وسلم এর ঘরে তার এতবেশি যাতায়াত ছিল যে, আগন্তুকরা মনে করতো তিনি নবীজী صلى الله عليه وسلم এর পরিবারেরই একজন সদস্য। নবীজী صلى الله عليه وسلم আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর ইলমের উপর এত আস্থাশীল ছিলেন যে, তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ আমার উম্মাতের জন্য যা পছন্দ করবে আমি তা পছন্দ করলাম, আর সে আমার উম্মাতের জন্য যা অপছন্দ করবে আমি তা অপছন্দ করলাম।' (ফাযায়েলুস সাহাবা, আহমাদ ইবনে হাম্বল হা.নং ১৫৩৬) নবীজী صلى الله عليه وسلم আরো বলেনঃ 'আমি যদি মাশওয়ারা ছাড়াই কাউকে আমার খলীফা নিযুক্ত করতাম, তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদকে আমার খলীফা বানাতাম।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:৭/৪২৩ মাকতাবায়ে শামেলা) নবীজী صلى الله عليه وسلم আরো বলেন, কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তরতাজাভাবে যে কুরআন পড়তে চায়, সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ এর তিলাওয়াত অনুসরণ করে।' (মুসনাদে আহমাদ হা.নং ১৮৪৫৭) নবীজী صلى الله عليه وسلم আরো বলেন,'তোমরা চারজন থেকে কুরআনের ইলম হাসিল করো; ১.আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ থেকে ২. উবাই ইবনে কাআব থেকে ৩. মুআয ইবনে

জাবাল থেকে ৪. আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেম থেকে।' (সুনানে তিরমিযী হা.নং৩৮৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. সম্পর্কে হযরত উমর রাযি. এর মন্তব্য হলো, كنيف ملىء علما 'তিনি ইলমে পরিপূর্ণ একটি ঘর।' (ফাযায়েলে সাহাবা হা.নং১৫৫০) সূরা মুহাম্মাদ এর ষোল নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তাদের (মুনাফিকদের) মধ্য থেকে কিছু লোক আপনার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদেরকে বলে, এই মাত্র তিনি কী বললেন?' এখানে জ্ঞানপ্রাপ্ত বলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. কে বুঝানো হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবীশাইবা:৭/২৯০ মাকতাবায়ে শামেলা)

আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. অসংখ্য ফযীলতের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি ফযীলতের কথা এখানে উল্লেখ করলাম যা দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি কূফা নগরীতে ছাত্রদের বিশাল মজমায় কুরআন-সুন্নাহের দরস দিতেন। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান দিতেন।

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়া রহ. বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে সাতজন সর্বাধিক ফাতাওয়া-ফারায়েযের কাজ করেছেন। তিনি সাতজনের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরে যথাক্রমে হযরত আলী রাযি. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি.কে উল্লেখ করেছেন। (উসূলুল ইফতা:পৃ.৩৪) আর আল্লাহর মেহেরবানীতে এই দু'জনই কূফা নগরীতে নিজেদের ইলম বিতরণ করেছেন। এই দু'জন ছাড়া আরো প্রায় পনেরশত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কূফা নগরীতে অবস্থান করেছিলেন। যার ফলে কূফা নগরী তখন ইলম চর্চার মারকাযে পরিণত হয়েছিল।

৩২ হিজরীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আলকামা বিন কয়েস রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কূফায় দরস ও তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে আহরিত কুরআন-সুন্নাহ, ও ফাতাওয়া-ফারায়েযের ইলম বিতরণ করতে থাকেন। ৬২ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ফকীহ ইবরাহীম নাখায়ী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৯৬ হিজরীতে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও ফাতাওয়া-ফারায়েযের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের পর ইলমের এই মীরাসের অধিকারী হন আবূ হানীফা রহ. এর উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান। হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর ইন্তিকালের পর কূফার ইলমী খিদমাত আঞ্জাম দিতে থাকেন। ১২০ হিজরীতে হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান রহ. এর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবূ হানীফা কূফার ইলমী মসনদে আরোহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.

তাঁর চল্লিশজন ছাত্রের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর মেহনত করে কুরআন-সুন্নাহ, ফাতাওয়া-ফারায়েযের যে ইলম তাঁর কাছে পৌঁছেছে তা তিনি অধ্যায় ভিত্তিক সাজিয়ে কিতাব আকারে সংকলন করেন। যেহেতু সংকলকদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তাই সংকলিত কুরআন-সুন্নাহর ঐ ইলমকে ফিকহু আবী হানীফা ও মাযহাবু আবী হানীফা (আবূ হানীফার ফিকহ বা আবূ হানীফার মাযহাব ও হানাফী মাযহাব) বলা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, হানাফী মাযহাব ইমাম আবূ হানীফার ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ নয়। হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার দ্বারা ইমাম আবূ হানীফাকে অনুসরণ করা হয় না; বরং হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার অর্থ হলো, কুরআন-সুন্নাহর ঐ ইলমকে অনুসরণ করা যা ইমাম আবূ হানীফা হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান এর সূত্রে, হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান ইবরাহীম নাখায়ী এর সূত্রে, ইবরাহীম নাখায়ী আলকামা বিন কায়েস এর সূত্রে, আলকামা বিন কায়েস আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. হযরত মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم এর সূত্রে, হযরত মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم জিবারাঈল আমীন আ. এর মাধ্যমে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন থেকে পেয়েছেন।

অতএব, যারা এ কথা বলে বেড়ায় যে, 'হানাফীরা কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে, স্বয়ং নবীজী صلى الله عليه وسلم কে ছেড়ে ইমাম আবূ হানীফাকে মানে, তাই তারা মুশরিক' তারা কী পরিমাণ অজ্ঞ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নির্ধারিত এক মাযহাবের তাকলীদ ও অতীতের উলামায়ে কেরামঃ

২৪১ হিজরীতে ইমাম আহমদ রহ. এর ইন্তিকালের পূর্বেই চার মাযহাব সংকলিত হয়ে যায়। চার মাযহাব ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর বুকে যত উলামায়ে কেরামের আগমন ঘটেছে তারা সকলেই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে যারা নিজেকে মুজতাহিদ মনে করতেন, তাদের কথা ভিন্ন। অনেকে বলে থাকে নির্ধারিত কোনো মাযহাবের তাকলীদ শুরু হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে। তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেনঃ

والاوزاعى امام اهل الشام وقد كانوا على مذهبه الى المائة الرابعة

'আওযায়ী রহ. সিরিয়াবাসীর ইমাম ছিল, চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সিরিয়াবাসী তাঁর মাযহাব অনুসরণ করত।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২০/৫৮৩)

ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন:

كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر، ثم فني العارفون به وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف.

www.muslimdm.com

'বেশ কিছু দিন সিরিয়া ও স্পেনের অধিবাসীরা আওযায়ী রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ছিল। অতঃপর একসময় তার মাযহাবের আলেমগণ নিঃশেষ হয়ে যায়, (এতে করে তার মাযহাবও হারিয়ে যায়, যেহেতু তার মাযহাব সংকলিত হয়নি) এখন তার মাযহাবের কিছু অংশ 'কুতুবুল খেলাফ' (এমন কিতাবসমূহ যার মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে)-এর মধ্যে পাওয়া যায়।' (তাযকিরাতুল হুফফায:১/১৩৪ শামেলা)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম যাহাবী রহ. এর বক্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্টই বুঝে আসে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর আগেও বিভিন্ন এলাকায় নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা হত। কারণ ইমাম আওযায়ী রহ. হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমাম ছিলেন। তিনি ১৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

সারকথা এই যে, চার মাযহাব যখন থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে কুরআন-হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে যত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম পৃথিবীর বুকে আগমন করেছেন তারা প্রত্যেকেই চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাব অনুসরণ করেছেন। তবে ইমামের দলীলের চেয়ে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু মাসআলায় তারা নিজ অনুসৃত ইমামের মতের বিরোধিতাও করেছেন। এখানে উম্মাতের বড় বড় কয়েকজন আলেমের নাম উল্লেখ করছি যারা কুরআন-হাদীস ও উলূমুল হাদীস সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শিতা সত্ত্বেও নিজের বুঝমত না চলে নির্দিষ্টভাবে কোনো একজন ইমামকে মেনে চলেছেন।

১. ইমাম দারাকুতনী ২. ইমাম বাইহাকী ৩. ইমাম ইবনে আব্দুল বার ৩. ইমাম মুনযিরী ৪. ইমাম ত্বহাবী ৫. ইমাম খাত্তাবী ৬. ইমাম নববী ৭. কাযী ইয়ায ৮. ইমাম যাহাবী ৯. ইমাম যাইলায়ী ১০. তকীউদ্দীন সুবকী ১১. ইবনে রজব হাম্বলী ১২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী ১৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ১৪. ইমাম ইবনে কাসীর ১৫. খতীবে বাগদাদী ১৬. ইবনুল মুনযির ১৭. ইমাম আবূ দাঊদ ১৮. ইমাম নাসাঈ ১৯. ইমাম রামাহুরমুযী ২০. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী ২১. ইমাম সাখাবী ২২. ইমাম ইবনে আব্দুল হাদী ২৩.ইমাম ইবনুল জাওযী ২৪. ইমাম জামালুদ্দীন মিযযী ২৫. ইমাম ইবনে মান্দাহ রহিমাহুমুল্লাহ।

এখানে উদাহরণস্বরূপ মাত্র পঁচিশজনের নাম উল্লেখ করা হলো। যারা বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট এক মাযহাব মেনে চলেছেন। বর্তমান আহলে হাদীস বন্ধুদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তারা এসব বড় বড় হাদীস বিশারদ ইমামদের থেকেও নিজেদেরকে বেশি জ্ঞানী মনে করেন, এজন্য তারা কোনো নির্দিষ্ট ইমামকে না মেনে নিজেদের বুঝ অনুযায়ী চলছে এবং অন্যদেরকেও তাদের মতামত গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করছে। উল্লেখিত বড় বড় ইমামদের চেয়ে নিজেদেরকে বেশি জ্ঞানী মনে করা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ না বোকামি? তার বিচারের ভার পাঠকের উপর ।

তাকলীদ না করার পক্ষে যাদের কথা দলীল হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে:

আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুরা অতীতের কয়েকজন আলেমের উক্তির অপব্যবহার করে কারো তাকলীদ করাকে নাজায়েয ও শিরক প্রমাণ করতে চায়। তারা সাধারণত যে কয়জন উলামায়ে কেরামের উক্তিকে নিজেদের পক্ষে উল্লেখ করে থাকেন তারা বাস্তবেই ঐ কথা বলেছেন কিনা বা বলে থাকলেও কার জন্য কোন্ প্রেক্ষাপটে বলেছেন, তা আমরা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

তারা সবচেয়ে বেশি যার কথা উল্লেখ করে তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। অথচ তাকলীদ জায়েয হওয়ার পক্ষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এত উক্তি করেছেন যে, তা যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে একটি মাঝারি আকৃতির একটি পুস্তক হয়ে যাবে। আমরা তাকলীদ বৈধ হওয়ার পক্ষে তার কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করছি:

والذى عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز فى الجملة والتقليد جائزفى الجملة... والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.

'উম্মাতের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতামত হলো বাস্তবে ইজতিহাদ করা জায়েয আর তাকলীদ করাও জায়েয... যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে পারে না তার জন্য তাকলীদ করা বৈধ।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২০/২০৩)

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেনঃ

من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من اهل العلم والدين و لم يتبين له ان قول غيره ارجح منه فهو محمود يثاب لايذم على ذالك ولايعاقب.

'যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম জানতে অক্ষম, সে যদি এ ক্ষেত্রে দ্বীনদার কোনো আলেম (মুজতাহিদ)-এর অনুসরণ করে এবং তার পক্ষে এটা জানা সম্ভব না হয় যে, অন্য ইমামের উক্তি তার অনুসরণীয় ইমামের উক্তির চেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তবুও সে প্রশংসার যোগ্য এবং সে সাওয়াবের অধিকারী হবে, এই তাকলীদের জন্য তাকে তিরস্কার করা যাবে না এবং আখেরাতেও সে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবে না।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২০/২২৫)

ইবনে তাইমিয়া রহ. এই উক্তি দ্বারা এ কথা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদঘাটন করতে অক্ষম তার জন্য উচিত হলো দ্বীনদার কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ করা । আর এ কথা স্পষ্ট যে, বর্তমান পৃথিবীর হাতেগোনা কয়েকজন বড় বড় আলেম ছাড়া সবার অবস্থাই এমন যে, তারা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদঘাটন করার যোগ্যতা

রাখে না। তাই ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উক্তি অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমেরই উচিত কোনো না কোনো মাযহাবের তাকলীদ করা।

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেনঃ

المقلد يقلد السلف اذ القرون المتقدمة افضل مما بعدها.

'যারা তাকলীদ করবে তাদের জন্য উচিত হলো সালফে সালেহীনের তাকলীদ করা। কারণ পূর্বের শতাব্দী পরবর্তী শতাব্দী থেকে উত্তম।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২০/৯)

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেনঃ

مسائل الاجتهاد من عمل فيه بقول بعض العلماء لم ينكر عليه و لم يهجر واذا كان فى المسألة قولان فان كان الانسان يظهرله رجحان احد القولين عمل به والا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم.

'ইজতিহাদী মাসাইলের মধ্যে যদি কেউ কোনো আলেম (মুজতাহিদ)-এর উক্তি অনুযায়ী আমল করে, তাহলে তাকে কোনো দোষ দেওয়া যাবে না এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে দুই ধরনের উক্তি থাকে আর সে যদি এমন হয় যে, তার কাছে কোনো এক উক্তি (দলীলের বিবেচনায়) প্রাধান্য পায়, তাহলে সে সে অনুযায়ী আমল করবে, অন্যথায় যে আলেমের উপর তার আস্থা হয় তার তাকলীদ (অনুসরণ) করবে।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২০/২০৭)

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উপরোক্ত উক্তিসমূহের সারকথা এই যে, তিনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমকে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, যে নিজেই কুরআন-সুন্নাহ ঘেটে পূর্ববর্তী ইমামদের উক্তির মধ্যে থেকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত নির্ণয় করতে পারে। আর যার এমন যোগ্যতা নেই তাকে তিনি তাকলীদ করতে বলেছেন। অতএব, ব্যাপকভাবে এ কথা বলা যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাকলীদকে নাজায়েয বলেছেন তা তাঁর উপর অপবাদ বৈ কিছু নয়।

ইবনুল কাইয়্যিম ও তাকলীদ

আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাকলীদ করা যাবে না মর্মে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর উক্তি বেশ জোশের সাথে উল্লেখ করে থাকে। অথচ তাকলীদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর অবস্থান পরিষ্কার নয়। কারণ তিনি 'ইলামুল মুআক্কিয়ীন'-এ তাকলীদ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন। তাকলীদ আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেনঃ

ذكر تفصيل القول فى التقليد. وانقسامه الى ما يحرم القول فيه والافتاء به والى ما يجب المصير اليه و الى مايسوغ من غير ايجاب.

‘তাকলীদের বিস্তারিত আলোচনাঃ তাকলীদ কখনো হারাম, কখনো ওয়াজিব ও কখনো জায়েয হয়, এই তিন প্রকার তাকলীদের বর্ণনা।’ (ই‘লামুল মুআক্কিয়ীন:২/১৬৮)

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উপরিউক্ত কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মতে তাকলীদ তিন প্রকারঃ ১. এমন তাকলীদ যা হারাম। হারাম তাকলীদের মধ্যে তিনি আলাদাভাবে তিন প্রকার তাকলীদকে উল্লেখ করেছেনঃ ক. আল্লাহ তা‘আলার হুকুম থেকে বিমুখ হয়ে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ। খ.এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা যার সম্পর্কে জানা নেই যে, সে বাস্তবে তাকলীদের উপযুক্ত কি না? গ. দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে অনুসৃত ইমামের মতামত কোনো ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তার তাকলীদ করা।

এই তিন ধরনের তাকলীদকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. হারাম বলেছেন। আমরাও এই তিন প্রকার তাকলীদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত। আমরাও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণকে জায়েয বলি না, আর এমন ইমামের তাকলীদ আমরা করি না বা করতে বলি না যার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আর ইমামের কোনো মতামত দলীল প্রমাণের আলোকে ভুল প্রমাণিত হওয়ার পরও সেক্ষেত্রে আমরা তার তাকলীদ করাকে জায়েয মনে করি না। মোটকথা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর এই মতামতের সাথে আমাদেরও কোনো বিরোধ নেই।

এই আলোচনার একটু পরে তিনি বলেনঃ

واما تقليد من بذل جهده فى اتباع ما انزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غيرمأزور كما سيأتى بيانه عنده ذكر التقليد الواجب والسائغ ان شاءالله.

‘আল্লাহ তা‘আলা যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিজ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে, আর যে বিষয়গুলো নিজে বুঝতে পারে না সে বিষয়ে তার চেয়ে বেশি কারো তাকলীদ করে, তাহলে সে প্রশংসনীয় কাজ করলো তাকে তিরস্কার করা হবে না, সে ছাওয়াব পাবে, গুনাহ হবে না। এর বিস্তারিত বর্ণনা ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদের আলোচনায় আসছে।’ (ই‘লামুল মুআক্কিয়ীন:২/১৬৯)

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর এই উক্তি মূলত ঐ বড় আলেমের জন্য যে নিজে নিজেই কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম আহকাম উদঘাটন করতে পারে। যে অংশ তার বুঝে আসে না সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো বড় আলেমের তাকলীদ করে।

আমাদের মতামতও এক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিম থেকে ভিন্ন নয়। কারণ এমন আলেম যে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদঘাটন করতে পারে

(যার মধ্যে একধরনের ইজতিহাদের যোগ্যতা এসে গেছে) তার জন্য আমরা নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদকে জরুরী বলি না।

এতটুকু পর্যন্ত ইবনুল কাইয়্যিম রহ. কথা ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর তিনি ৮০-৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করে সব ধরনের তাকলীদকে নাজায়েয ও হারাম প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। এমন কি এমন সাধারণ মুসলিম যে কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে কিছুই জানে না সেও যদি তাকলীদ করে তাকেও তিনি মূর্খ ও গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ

المقلد ان كان يعرف ما انزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد وان كان لم يعرف ما انزل الله على رسوله فهو جاهل ضال باقراره على نفسه. اعلام الموقعين:٢/١٧٠

এখানে তিনি তাকলীদ ও মুকাল্লিদদের সমালোচনায় এত নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে, ইতোপূর্বে ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন, তাও বে-মালুম ভুলে গেছেন। এই দীর্ঘ প্রায় ৯০ পৃষ্ঠার আলোচনায় তিনি ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই আর করেন নি।

তাকলীদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর আলোচনা মনোযোগসহ যে-ই অধ্যায়ন করবে, তার জন্য এই ফলাফলে পৌঁছা কষ্টকর হবে না যে, তাকলীদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর মতামত অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী। কোনো আলেমের অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী মতামতকে নিজেদের পক্ষের বড় দলীল মনে করা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কী হতে পারে! অবশ্য তার কথা দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, তার মতে তাকলীদের এমন একটি প্রকার আছে যা জায়েয, আর এমন একটি প্রকারও আছে যা ওয়াজিব। কিন্তু তিনি মুকাল্লিদদের দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে সেগুলোর আলোচনা ভুলে গেছেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ও তাকলীদ

আহলে হাদীস ভাইদের কাছে তাকলীদ না করার ব্যাপারে আরেকজন মান্যবর ব্যক্তি হলেন শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ.। তাকলীদ করা যাবে না মর্মে তারা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর উক্তিও দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। অথচ আমাদের জানা মতে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী রহ. চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোনো মাযহাবের তাকলীদ করতে নিষেধ করেননি। বরং তিনি নিজে, তার পুত্র ও তার সিলসিলার (সালাফী সিলসিলার) অন্যান্য আলেমগণ সবাই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব তাঁর উপর উত্থাপিত কিছু অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেনঃ

www.muslimdm.com

منها قوله انی مبطل کتب المذاهب الاربعة وانی اقول ان الناس من ست مائة سنة ليسوا على شي ء وانی ادعى الاجتهاد وانی خارج عن التقليد... جوابی عن هذه المسائل ان اقول : سبحانك هذا بهتان عظيم.

'সে সব অভিযোগের মধ্য থেকে কয়েকটি এইঃ আমি না কি বলি ১. চার মাযহাবের কিতাবসমূহ বাতিল ২. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা ভিত্তিহীন জিনিসের উপর আমল করে আসছে ৩. আমি মুজতাহিদ হওয়ার দাবীদার, আমি তাকলীদ করি না । এসব অভিযোগের জবাবে আমি শুধু এতটুকুই বলবো, আল্লাহর কসম এগুলি সবই আমার উপর আরোপিত অপবাদ বৈ কিছু নয়।' (আররাসাইলুশ শাখসিয়া:পৃ.৪)

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর পুত্র শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ যিনি পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তিনি বলেনঃ

ونحن ايضا فی الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ولا ننكر على من قلد احد الاربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير.

'ফিকহী মাসাইলের ক্ষেত্রে আমরা আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর তাকলীদ করা। আর যে ব্যক্তি চার মাযহাবের মধ্যে থেকে কোনো একটির তাকলীদ করে আমরা তার উপর কোনো অভিযোগ করি না। তবে আমরা (চার মাযহাব ছাড়া) অন্য কোনো মাযহাবের উপর চলতে দেই না কারণ, অন্য মাযহাব সংকলিত ও সংরক্ষিত নয়।' (আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজবিবাতিন নাজদিয়্যাহ:১/২২৭)

শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর সিলসিলার একজন বড় আলেম ও দাঈ শায়েখ মুহাম্মাদ আল উসাইমীন রহ. তাকলীদের দুইটি প্রকার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

احدها ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد.

'তাকলীদের একটি প্রকার হলো; তাকলীদকারী এমন সাধারণ লোক হওয়া, যে নিজে নিজে (কুরআন-সুন্নাহ থেকে) বিধান উদঘাটন করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তার ফরয হলো তাকলীদ করা।' (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল:পৃ.৮৭)

সারকথা, নির্ভরযোগ্য সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ মুসলিমদের জন্য চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা জরুরী। তবে কুরআন-সুন্নাহ উপর বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমের নিকট যদি তার অনুসৃত ইমামের কোনো বিশেষ মাসআলা নিজ গবেষণা অনুযায়ী কুরআন সুন্নাহর অন্য কোনো দলীলের বিরোধী সাব্যস্ত হয়, সে ক্ষেত্রে তার জন্য ঐ মাসআলার মধ্যে চার মাযহাবের মধ্য থেকে অন্য কোনো মাযহাব মানার এখতিয়ার থাকবে। বরং ইমামের মত নিশ্চিতভাবে ভুল প্রমাণিত হলে,তার জন্য ঐ মাসআলায় নিজ গবেষণা অনুযায়ী অন্যমত গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

www.muslimdm.com

আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুরা বাংলা বই থেকে দুই একটি হাদীসের অনুবাদ পড়ে নিজেকে কুরআন-সুন্নাহের ব্যাপারে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনে করলে তাদেরকে কিছু বলার মতো ভাষা আমাদের নেই। আহলে হক উলামায়ে কেরাম ৫০-৬০ বছর যাবৎ লাগাতার কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করার পরও নিজেকে ঐ স্তরের বিজ্ঞ আলেম মনে করার সাহস পায় না যাদের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ইমামের মতের বিরূদ্ধে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অথচ আহলে হাদীস বন্ধুরা দু'চারটা হাদীস মুখস্থ করে নিজেকে কেমন যেন সেই পর্যায়ের আলেম ভাবতে শুরু করে দেয়। আল্লাহ তা'আলার কাছেই সকল অভিযোগ।

আহলে হাদীস বন্ধুরা যদিও তাকলীদ না করার দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তারা আহলে হাদীস পণ্ডিতদের তাকলীদ করে থাকে। কারণ, আহলে হাদীস পণ্ডিতরা যা বলে দেয় সাধারণ আহলে হাদীস ভাইয়েরা অন্ধের মত তাই মুখস্থ করে বলে বেড়ায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের পণ্ডিতদের তাকলীদ করছে, আর আমরা মাযহাব অনুসারীরা নিজ নিজ ইমামের তাকলীদ করছি। সাধারণ আহলে হাদীস ভাইদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, খাইরুল কুরুনের ইমাম, ইমাম আজম আবূ হানীফা রহ. এর তাকলীদ করা উত্তম নাকি বর্তমান যমানার স্কলার আহলে হাদীস পণ্ডিতদের তাকলীদ করা উত্তম? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ ও তার নিরসন

হানাফী মাযহাব হলো পৃথিবীর সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান এই মাযহাব অনুসারেই কুরআন-সুন্নাহর বিধান মেনে চলে আসছে।

আহলুল হাদীস সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে হানাফী মাযহাবকে কেউ অভিযুক্ত করেন নি। এ দলটি সূচনালগ্ন থেকেই হানাফী মাযহাবের উপর বিভিন্ন অভিযোগ আরোপ করে আসছে। তন্মধ্যে তাদের একটি বড় ও প্রসিদ্ধ অভিযোগ হলো, হানাফীগণ সাধারণত 'যঈফ' হাদীসের উপর আমল করে থাকে। মূলত এটি একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রোপাগান্ডা ও ভিত্তিহীন অভিযোগমাত্র।

কেউ যদি ইনসাফের সাথে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী পাঠ করেন, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকৃত সত্য জানার জন্য নিম্নের কিতাবগুলো অধ্যয়ণ করেন তাহলে তিনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, অভিযোগটি কতটা অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

কিতাবগুলো হলো:-

১. কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা (ইমাম মুহাম্মাদ রহ.)

২. মুআত্তা মুহাম্মাদ (ইমাম মুহাম্মাদ রহ.)

৩. কিতাবুল আছার (ইমাম আবূ হানীফা রহ.)

৪. শরহু মা'আনিল আছার (ইমাম তহাবী রহ.)

৫. ফাতহুল কাদীর (ইবনুল হুমাম রহ.)

৬. নাসবুর রায়াহ (জামালুদ্দীন যাইলাঈ রহ.)

৭. আল জাওহারুন-নাকী (আলাউদ্দীন আত-তুরকুমানী রহ.)

৮. উমদাতুল ক্বারী (বদরুদ্দীন আইনী রহ.)

৯. ফাতহুল মুলহিম (শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.)

১০. বাযলুল মাজহুদ (খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.)

১১. ইলাউস সুনান (যফর আহমাদ উসমানী রহ.)

১২. মা'আরিফুস সুনান (মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী রহ.)

১৩. আছারুস সুনান (জহির নিমাবী)

১৪. ফয়জুল বারী (আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.)

১৫. আউজাযুল মাসালিক (যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.)

১৬. আমানিল আহবার (ইউসুফ কান্ধলভী রহ.)

এই কিতাবগুলোতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হানাফী মাযহাবকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মাসআলা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। তাই এই কিতাবগুলো পাঠ করে আপনিই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, হানাফী মাযহাব যঈফ হাদীস নির্ভর নাকি কুরআন-সুন্নাহসম্মত একটি সুদৃঢ় মাযহাব, যার স্বীকৃতি প্রতি যুগের মুহাক্কিক আলেমগণ দিয়েছেন।

তথাপি কিছু লোক এ অবান্তর অভিযোগ তোলে যে, "হানাফীগণ কোনো মাসআলায় সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও তার উপর আমল না করে যঈফ হাদীসের উপর আমল করে থাকে"।

আমরা এখানে চারটি ধারায় এই অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করবো ইনশাআল্লাহ।

১ম ধারাঃ

চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণের পরবর্তীকালে যে সকল ফুকাহায়ে কেরাম উক্ত মাযহাব সমূহের উপর কিতাবাদী রচনা করেছেন, তাতে মাসআলার সমর্থনে যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়, সে হাদীসগুলো মূলত হুবহু ঐ দলীল নয়, যার উপর স্বয়ং ইমামগণ মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন।

হ্যাঁ, অনেক সময় সংকলনকারীগণ-ইমাম যে দলীলের উপর ভিত্তি করে মাসআলা বর্ণনা করেছেন-সে দলীলই উল্লেখ করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি যেসব হাদীস উল্লেখ করেন তার সবই ইমামগণের প্রধান দলীল এবং ইমামগণ কর্তৃকই নির্বাচিত।

আসল কথা হল, ফিকহের কিতাবাদিতে মূল মাসআলা সমূহ তো প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণেরই সংকলন করা, কিন্তু মাসআলাগুলোর সমর্থনে যে দলীল উল্লেখ করা হয়, তা অধিকাংশ সময়ই ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত তাদের নিজস্ব দলীল নয়, বরং সংকলনকারী কিতাব সংকলন করতে গিয়ে মাসআলার সমর্থনে নিজের অনুসন্ধানে যে হাদীস পেয়েছেন, তাই তিনি উল্লেখ করেছেন। আহলে ইলমগণ তো বুঝতেই পারছেন যে, তা ইমামের মূল দলীল নয়, বরং ইমামের নিকট অন্য কোন হাদীস ছিল, যার উপর ভিত্তি করে তিনি মাসআলা বের করেছেন।

সুতরাং পরবর্তীতে সংকলিত কিতাবাদিতে কোন হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা পাওয়া গেলে তার দায়ভার ইমামের উপর বর্তাবে না এবং এর দ্বারা মাসআলার দুর্বলতা প্রমাণিত হওয়ারও কোন সুযোগ নেই, কারণ, মাসআলার ভিত্তি হিসেবে ইমাম সাহেবের নিকট অন্য কোন মজবুত দলীল ছিল অথবা তার পরবর্তী যমানায় যঈফ রাবী যুক্ত হয়েছে। এ জাতীয় যঈফ হাদীসের কারণে কোন ইমাম ও তার মাযহাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ইনসাফপূর্ণ আচরণ নয়।

এ নীতিটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয় হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজে তার ফিকহের দলীল নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলন করে যাননি। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ রহ. ও নিজেদের ফিকহ ও দলীল সংকলন করে যাননি। আর ইমাম শাফেঈ রহ. তার ‘কিতাবুল উম্ম’ এ নিজের কিছু ফিকহ ও দলীল সংকলন করেছেন বটে, কিন্তু সমুদয় দলীল সংকলন করেননি।

অতএব, যে হাদীস আমরা হানাফী মাযহাবের ‘হেদায়া’ কিতাবে, মালেকী মাযহাবের ‘আর রিসালা’ তে, শাফেঈ মাযহাবের ‘মুহাযযাবে’ এবং হাম্বলী মাযহাবের ‘আল মুগনী’ তে পাই, এগুলোর অধিকাংশ হাদীসই ঐ মাযহাবের ইমামের মূল দলীল নয়।

এই মূলনীতিটি জানা না থাকার কারণে আহলে হাদীসের কোন কোন আলেম হানাফী মাযহাবের ফিক্বহের কিতাব ‘হেদায়া’তে বর্ণিত মাসআলা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর মাযহাবের ব্যাপারে অনেক আপত্তিকর ও অবান্তর কথার অবতারণা করেছেন।

তারা হেদায়া এর হাদীস ‘তাখরীজ’ (সূত্র উল্লেখ) করতে গিয়ে যখন দেখলেন যে, মুহাদ্দিসগণ এই কিতাবে উল্লেখিত অনেক হাদীসকে ‘যঈফ’ ‘মাওযু’ ‘গাইরে মারফু’ ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছেন, তখন তারা সেই হাদীসগুলোকে মাযহাবের স্বয়ং ইমাম কর্তৃক উদ্ধৃত দলীল মনে করে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার মাযহাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করে বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতের বিষয়ে

আবূ হানীফা রহ.কে কীভাবে আমরা ইমাম ও মুজতাহিদ হিসেবে মানব? অথচ তিনি ‘মওযু’ হাদীস দিয়ে দলীল দিয়ে থাকেন। ‘মওকুফ’ ও ‘মাকতু’ (অর্থাৎ সাহাবীকর্তৃক বর্ণিত কথা বা সনদে বিচ্ছিন্নতা) হওয়া সত্ত্বেও তাকে রাসূলের হাদীস বলে দেন।

মূলত উক্ত বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করেছে।

সংকলনকারীগণ যে নিজের পক্ষ থেকেই মাসআলার সমর্থনে দলীল উল্লেখ করে থাকেন, এই কথার দু‘টি দলীল আমি উল্লেখ করছি।

১ম দলীল:-

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন হাদীসের উপর আমল করতে চায় বা কোন মাযহাবের ইমামের মাসআলার সমর্থনে হাদীস দ্বারা দলীল দিতে চায় এবং সে এ বিষয়ে পারদর্শীও হয়, তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হলো, সে তার কপিটিকে কিতাবের মূল কপির সাথে মিলিয়ে দেখবে, চাই মূল কপিটির সাথে সে নিজে মিলিয়ে নিক বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মিলাক।’ (মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ পৃ. ২৫)

ইমাম ইবনুস সালাহ এর উক্তিঃ ‘কোন মাযহাবের ইমামের মাসআলার সমর্থনে হাদীস দিয়ে দলীল দিতে চায় এবং সে এ বিষয়ে পারদর্শীও হয়’ এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সংকলনকারীগণ নিজের থেকে মাসআলার সমর্থনে হাদীস উল্লেখ করে থাকেন।

২য় দলীল:-

ইবনুল কায়্যিম রহ. তার কিতাব বাদায়িউল ফাওয়াইদ এর প্রথম ফায়দাতে বলেনঃ لاشفعة لنصرانى অর্থাৎ: কোনো খ্রিস্টানের জন্য শুফআ [তথা পার্শ্ববর্তিতার সূত্রে জমিক্রয়ে অগ্রাধিকার লাভ] এর হক নেই এই হাদীস দ্বারা জনৈক আলেম ইমাম আহমাদ রহ. এর মাযহাবের দলীল দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ রহ. ভালো করেই জানতেন যে, এর দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। কেননা এটি একজন তাবেঈর উক্তি মাত্র। অথচ হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবনে কুদামা রহ. তার কিতাব আল মুগনীতে এর দ্বারা দলীল দিয়েছেন এবং এটিকে দারাকুতনীর ইলাল কিতাবের সূত্রে হযরত আনাস রাযি. বর্ণিত মারফূ হাদীস সাব্যস্ত করেছেন। অপরদিকে বাইহাকী রহ. তার সুনানে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এটি হাসান বসরীর উক্তি, মারফূ হাদীস নয়। (আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ.২১০)

এখানে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর উক্তি ‘এই হাদীস দ্বারা জনৈক আলেম ইমাম আহমাদ রহ. এর মাযহাবের দলীল দিয়েছেন’। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সংকলনকারীগণ মাসআলার সমর্থনে অনেক হাদীস নিজের অনুসন্ধান অনুযায়ী

উল্লেখ করে থাকেন। অতএব পরবর্তী কিতাবগুলোর কোন হাদীসে দুর্বলতা পাওয়া গেলে ইমামকে বা তার মাযহাবকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, বরং সেটাকে বর্ণনাকারীর ত্র”টি সাব্যস্ত করতে হবে।

২য় ধারা:

কখনো এমন হয় যে, ফিকহ সংকলনকারীগণ তাদের কিতাবে যে হাদীস উল্লেখ করেন তা স্বয়ং ইমামের দলীল। কিন্তু কোন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে শুধুমাত্র পরবর্তী যামানায় লিখিত হাদীসের কিতাব যেমন সিহাহ, সুনান, মাসানিদ ও মাআজিমে তালাশ করে হাদীসের কিতাবাদির সনদের ভিত্তিতে হাদীসটিকে অপ্রামাণ্য মনে করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি ফিকহের হাদীসসমূহকে শুধুমাত্র পরবর্তীকালে সংকলিত হাদীসের গ্রন্থসমূহে তালাশ করেন, তিনি হাদীসের সনদে দুর্বলতা দেখে হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করেন এবং ইমামের উপর অপবাদ দেন, অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করেন।

আর যে ব্যক্তি ইনসাফের সাথে নিরপেক্ষভাবে হাদীস অনুসন্ধান করেন এবং মুহাদ্দিসগণের কিতাবের পাশাপাশি ইমামগণের নিজস্ব কিতাবেও সমান দৃষ্টি রাখেন, তিনি হাদীসটিকে সহীহ সনদে পেয়ে যান। এভাবে তিনি প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন এবং ইমামগণ যে বাস্তবেই আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা যে পথভ্রষ্ট, এ বিশ্বাস অন্তরে আরও বদ্ধমূল হয়ে যায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হলঃ হেদায়া কিতাবের গ্রন্থকার তার কিতাবে "ادرئوا الحدود بالشبهات"এই হাদীসটি মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি যায়লাঈ রহ. নসবুর রায়াতে তাখরীজ করেছেন যে, এটি মওকূফ; হযরত উমর রাযি. এর উক্তি, কিন্তু সনদে বিছিন্নতা রয়েছে। হযরত মুআয রাযি. হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি. এবং হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি.এ তিন সাহাবীরও উক্তি এটি। কিন্তু সনদে ইবনু আবী ফারওয়া রয়েছেন, আর তিনি মাতরূক তথা পরিত্যক্ত। এটি ইমাম যুহরী রহ.এরও উক্তি। তবে তিনি যেহেতু তাবিঈ তাই তার উক্তি দলীল হতে পারে না। ইবনে হাযম রহ. হাদীসটিকে মারফূ হিসেবে না পেয়ে মুহাল্লাতেই হাদীস সম্পর্কে এবং যে সকল ফকীহগণ এটিকে দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন তাদের ব্যাপারে অনেক রূঢ় শব্দ উচ্চারণ করেছেন, তার কলম ও যবান নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে, যেমনটি তার সাধারণ অভ্যাস। (আল্লাহ তা‘আলা হিফাযতকারী)

বিশিষ্ট মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. ‘ফাতহুল কাদীর’ এ ইবনে হাযমের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন এবং

ادرؤاالحدود بالشبهات এর অর্থ বুখারী, মুসলিমের কয়েকটি হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রা. এর বর্ণনা তালাশ করলে এ হাদীসের সত্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন আমরা জানি, হযরত মায়েজ রাযি. যিনি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেছিলেন, তাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: হয়ত তুমি চুম্বন করেছ বা স্পর্শ করেছ, বা মর্দন করেছ। নবীজী صلى الله عليه وسلم তাকে এসব বলেছেন যেন সে এর কোন একটিকে স্বীকার করে নেয়, যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। অন্যথায় এ কথাগুলো বলার কোন অর্থ নেই।

হদ (শরী‘আত নির্ধারিত দণ্ড) ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রমাণ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ যথা ঋণখেলাপীর কথা স্বীকার করেছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, “হয়ত তোমার কাছে তা আমানত ছিল, পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে” বা এ জাতীয় কোন কৌশল শিখিয়েছেন যাতে সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে। অতএব, এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে, যথা সম্ভব ‘হদ’ যেন প্রমাণিত না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। তারপরও শরী‘আতে অত্যাবশ্যকীয় এ শাশ্বত বিধান সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা শরী‘আতের কোন অকাট্য প্রমাণিত বিষয়ে সংশয় পোষণ করারই নামান্তর।

www.muslimdm.com

তাছাড়া এই হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ সনদে তার মুসনাদের কিতাবুল হুদূদের চার নাম্বারে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আবূ হানীফা মিকসাম এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদের রাবী মিকসামের অবস্থা নিম্নরূপঃ

ইমাম আহমাদ ইবনু সালেহ আল মিসরী (যিনি মিসরের তৎকালীন ইমাম ছিলেন) ইজলী, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান এবং ইমাম দারাকুতনী এই ইমামত্রয় মিকসামকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আর ইবনে আব্বাস রাযি. তো নিজেই নিজের তুলনা, এই সনদ ছাড়া হাদীসটির আর কোন মারফু’ সহীহ সনদ নেই। এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, ইমামগণেরও নিজস্ব সনদ রয়েছে এবং ফিকহের কিতাবের হাদীস তাখরীজ করার ক্ষেত্রে সম্ভব হলে তাদের নিজস্ব কিতাবাদি থেকেই তাখরীজ করতে হবে। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের তাখরীজকে ইমামগণের বর্ণনা যাচাইয়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা যাবে না এবং তাদের তাখরীজের উপর নির্ভর করে ইমামদের মাযহাবকে দুর্বল ভাবা যাবে না।

তাখরীজের এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেই আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. ‘মুনয়াতুল আলমাঈ’ নামক কিতাবে ঐ সকল হাদীসের সনদ দেখিয়েছেন, যেগুলো যাইলাঈ রহ. নাসবুর রায়াতে এবং ইবনে হাজার রহ, দেরায়াহতে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সনদ তিনি ফিকহে হানাফির মৌলিক উৎস তথা হানাফি ইমামগণের রচিত হাদীসও ফিকহের কিতাবাদি থেকে উদ্ধার করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ., ও রফউল মালাম কিতাবে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে বলেনঃ ‘হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলনের পূর্বের ইমামগণ পরবর্তীদের তুলনায় সুন্নাহর ব্যাপারে অনেক বেশি অবগত ছিলেন, কেননা অনেক হাদীস যা তাদের কাছে সহীহ সনদে পোঁছেছে সেগুলোই আমাদের কাছে মাজহুল তথা অপরিচিত রাবীর মাধ্যমে পোঁছেছে বা মুনকাতি তথা বিচ্ছিন্ন সনদে পোঁছেছে বা একেবারেই পোঁছেনি।’

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. কথা ‘একেবারেই পোঁছেনি’ ইবনে হাজার রহ. এর কথার সাথে একেবারে মিলে যায়, ইবনে হাজার রহ, কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ঐ সকল হাদীস যেগুলো দ্বারা শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ এবং হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাদের ফিকহের কিতাবাদিতে দলীল দিয়ে থাকেন তার অধিকাংশই হাদিসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না, এর কারণ কী?

তিনি উত্তর দিলেন, হাদীসের অনেক কিতাব বা অধিকাংশ কিতাব তাতারি ফেতনার সময় নষ্ট হয়ে গেছে, হয়তো ঐ হাদীসগুলো তাতেই তাখরীজ করা ছিল, কিন্তু তা আমাদের কাছে পোঁছেনি।

এ কারণেই যারা কোন কিতাবের হাদীস তাখরীজ করেছেন, যথা যাইলাঈ রহ., ইরাকী রহ., ইবনুল মুলাক্কীন রহ. এবং ইবনে হাজার রহ. তারা কোন হাদীস না পেলে কারো উপর দোষ না চাপিয়ে খুবই সতর্কতার সাথে বলেছেন যে, এ হাদীসটি আমি পাই নি, এ কথা বলেন নি যে, এটা পাওয়া যায় না বা এর কোন ভিত্তি নেই।

৩য় ধারাঃ

কখনো ফুকাহায়ে কেরামের দলীল হিসেবে পেশ করা হাদীসটি সনদের দিক থেকে তথা তাদের এবং পরবর্তীদের সকল সূত্র বাস্তবেই যঈফ হয়,কিন্তু হাদীস এর সপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহয় ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাওয়ার কারণে হাদীস যঈফ হওয়া সত্ত্বেও তারা এটি আমল যোগ্য মনে করেছেন। যে সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়, সেগুলোই ইমামের মূল দলীল থাকে, যেহেতু আয়াত ও সহীহ হাদিসের সমর্থন সুস্পষ্ট নয়, এর বিপরীতে হাদীসটি উক্ত মাসআলায় সুস্পষ্ট, তাই পরবর্তী ফকীহগণ শুধুমাত্র হাদীসটিই উল্লেখ করে থাকেন, যদিও মাসআলার মূল ভিত্তি ঐ সকল আয়াত ও সহীহ

হাদীসের উপরই থাকে, যা দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়, অন্যান্য সমর্থনকারী বিষয়গুলো উল্লেখ করেন না,

দুটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করছিঃ

(ক) তালাক দেওয়ার অধিকার হল মূলত পুরুষের। ফুকাহায়ে কেরাম এর দলীল দিয়েছেন এই হাদীস দিয়েঃ انما الطلاق لمن أخذ بالساق. অর্থাৎ তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল পুরুষের।

হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে হাদীসটি সনদের দিক থেকে যঈফ। কিন্তু যেহেতু কুরআনের তালাক সংক্রান্ত আয়াতগুলো হাদীসটিকে সমর্থন করছে, তালাক প্রদানের অধিকারী পুরুষকে সাব্যস্ত করেছে, মহিলাকে নয়, তার সমর্থনে কুরআনের আয়াত বিদ্যমান থাকায় হাদীসটির দুর্বলতা এখানে গৌণ।

ইবনুল কাইয়ূম রহ. যাদুল মাআদে বলেন, ইবনে আব্বাস রা. এর এই হাদীসটির সনদে যদিও সমস্যা রয়েছে, কিন্তু কুরআন এই হাদীসটির সমর্থন করছে এ অনুসারেই প্রতিটি যুগে সকলের আমল চলে আসছে।

(খ) ফুকাহায়ে কেরাম টয়লেটে প্রবেশের সময় মাথা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব বলেছেন, এর সপক্ষে যে হাদীসটি রয়েছে তা হলঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তখন জুতা পরিধান করতেন, এবং মাথা ঢেকে নিতেন।

হাদিসের সনদ যদিও যঈফ, কিন্তু বুখারির মাগাযীতে এর সমর্থনে ১টি হাদীস রয়েছে, তা হলঃ فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة.

(হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি. নিজের ঘটনার বর্ণনা এভাবে দিচ্ছেন যে, তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে ফটকের কাছাকাছি স্থানে মাথা ঢেকে এমনভাবে বসে পড়লেন যেন তিনি ইস্তেঞ্জা করছেন, অন্য বর্ণনায় এর অর্থ আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি মাথা ঢেকে বসে পড়লাম, যাতে মনে হয় যে আমি ইস্তেঞ্জা করছি। (বুখারীঃ হা, নং, ৪০৩৯, ৪০৪০)

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইস্তেঞ্জার সময় মাথা ঢেকে রাখার বিষয়টি তাদের অভ্যাস ছিল।

আবূল হাসান ইবনুল হাসসার রহ. বলেন, যখন হাদিসের সনদে কোন মিথ্যাবাদী না থাকে, উপরন্তু কুরআনের কোন আয়াত এর সমর্থন করে, অথবা হাদীসটি শরী'আতের মূলনীতির সাথে মিল রাখে, তখন ফকীহগণ এ ধরণের হাদীসকে সহীহ বলেন এবং ঐ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

চতুর্থ ধারাঃ

কখনো এমন হয় যে, ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণিত হাদীসটি যঈফ হয়, কিন্তু উক্ত মাসআলায় উক্ত যঈফ হাদীস ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাও নেই। তাই তারা অনন্যোপায় হয়ে যঈফ হাদীসকেই প্রাধান্য দিয়ে কিয়াস বর্জন করে থাকেন। এই নীতি অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা রহ. অট্টহাসি দ্বারা উযু ভেঙ্গে যাওয়া, মধুর উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া, প্রভৃতি মাসাইলে যঈফ হাদিসের মাধ্যমে কিয়াস বর্জন করেছেন এবং যঈফ হাদীস দ্বারা মাসআলা প্রমাণ করেছেন।

হাদীস বিষয়ক কিছু মৌলিক নীতিমালা যা সামনে থাকলে হানাফী মাযহাবের উপর উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর সহজেই বুঝে আসবে

১. সর্ব প্রথম যে কথাটি জেনে রাখা দরকার তা হলঃ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিতাব দুটি সহীহ হাদিসের সংকলন মাত্র, এই দুটি কিতাবের বাহিরে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে, এটা শুধু মৌখিক দাবিই নয়, বরং এটা এমন এক বাস্তবতা যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই, একথা স্বয়ং বুখারী ও মুসলিম রহ. ও স্বীকার করেছেন।

আর হাদীসের সিহ্যাত তথা বিশুদ্ধতা কোন কিতাবের উপর নির্ভর করে না যে, অমুক কিতাবে থাকলে সহীহ না থাকলে যঈফ, এ ধরণের কথা কোন বিবেকবান মানুষও বলতে পারে না, বরং হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতিতে বর্ণিত শর্তাবলীর উপর, যে হাদীসের মধ্যে উক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাবে সেটাই সহীহ হাদীস, আর যে সকল হাদীস শর্তের মাপকাঠিতে উন্নীত নয় সেটা সহীহ নয়।

অতএব, সহীহ হাদীস শুধু বুখারী-মুসলিমেই আছে অন্য কোন কিতাবে নেই, অথবা অন্য কিতাবের হাদীসসমূহ এ দুটোর চেয়ে নিম্নমানের এ ধরণের ভিত্তিহীন কথা কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত নেই এবং কার্যত এর কোন বাস্তবতাও নেই।

মোটকথা, যে কোন হাদীসকে বিচার করতে হবে হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে, নির্দিষ্ট কোন কিতাবের আলোকে নয়, এই বিষয়টি মাথায় রেখে কেউ যদি বিচার করে তাহলে হানাফি মাযহাবের বিরুদ্ধে প্রচারিত অনেক অমূলক অভিযোগ ও অপপ্রচারের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২. মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে পরস্পর মতপার্থক্যের যে রূপটি আমরা ফিকহের কিতাবাদিতে দেখি এবং একই মাসআলায় এক ইমাম থেকে একাধিক উক্তি পাই, এর প্রধান কারণ হল, একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী হাদীস পাওয়া যাওয়া, আয়াত ও হাদীস একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখা, আয়াত ও হাদীসব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়া অথবা কোন নতুন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে কোন স্পষ্ট বিধান

না পাওয়া যাওয়া। সাধারণত এই ধরনের বিষয়েই ইমামগণের ইজতিহাদ করতে হয়, আর প্রত্যেক মুজতাহিদের তরীকে ইস্তেদলাল ও ইস্তিমবাত তথা দলীল-প্রমাণের প্রায়োগিক পদ্ধতি ও মাসাইল আহরণের নীতিমালা সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র । যেমন একই বিষয়ে দৃশ্যত বিরোধপূর্ণ হাদীস থাকলে মুজতাহিদগণ কীভাবে সমাধান করেন এর একটু নমুনা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে, মতপার্থক্য না হয়ে কোন উপায় নেই।

একই বিষয়ে দৃশ্যত বিরোধপূর্ণ হাদীস থাকলে ইমাম মালেক রহ. মদীনাস্থ ফুকাহায়ে কেরামের আমল অনুযায়ী ফায়সালা দিয়ে থাকেন এই ভিত্তিতে যে, মদিনা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর, খুলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থানস্থল, আহলে বাইত ও আওলাদে রাসূল صلى الله عليه وسلم এর বাসভূমি, অহী নাযিল হওয়ার স্থান। অতএব মদীনাবাসীই ওহীর মর্ম অনুধাবনে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবেন এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং কোন হাদীস তাদের আমলের বিপরীত হলে অবশ্যই সেটা হয়ত মানসুখ তথা রহিত, বা ব্যাখ্যাকৃত, বা ব্যক্তি বিশেষ বা স্থান বিশেষ এর সাথে সম্পৃক্ত, বা মূল ঘটনা এখানে অসম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, তাই এটি দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম শাফিয়ী রহ. এ ক্ষেত্রে হেজাযবাসি ফকীহগণের আমল পরিলক্ষণ করেন, পাশাপাশি সর্বাধিক সহীহ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করেন। কোন বর্ণনাকে এক অবস্থার সাথে এবং অন্য বর্ণনাকে অন্য অবস্থার সাথে নির্ধারণ করে যথাসম্ভব মিল করে দেন। অতঃপর যখন তিনি ইরাক ও শেষ জীবনে মিসর সফর করেন, সেখানে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে অনেক বর্ণনা শুনেন, তন্মধ্যে কিছু বর্ণনা তার নিকট হেজাযবাসির আমলের উপর প্রাধান্য পায়, ফলশ্রুতিতে শাফিয়ী মাযহাবে অনেক মাসআলায় নতুন-পুরাতন দুই ধরনের উক্তি পাওয়া যায়।

ইমাম আহমাদ রহ. প্রতিটি হাদীস বাহ্যিক অবস্থার উপর বহাল রাখেন, মাসআলার প্রেক্ষাপট এক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটিকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। তার মাযহাব ইজতিহাদের বিপরীত ও হাদীসের যাহের অনুযায়ী, তাই হাম্বলী মাযহাবকে যাহেরীও বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা এবং তার আসহাবগণের নীতি হলঃ সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর মধ্যে এমন একটি যুক্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো, যেন সকল হাদীসের মাঝেই একটি অর্থবহ প্রেক্ষাপট তৈরী হয় এবং কোন একটি হাদীসকেও বর্জন করতে না হয়।

অধিকন্তু বাহ্যিক বিরোধটাও দূর হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে তারা শরী'আতের মৌলিক নীতিমালার সাথে বিশেষ করে কুরআন শরীফের কোন আয়াত দ্বারা সমর্থিত কোন হাদীসকে মৌলিকরূপে গ্রহণ করেন, যদিও সেটা সনদের দিক থেকে কিছুটা

কম সহীহ, হাসান হয়, বা মারজুহ হয়, আর তুলনামূলক অধিক সহীহ হাদীসটির বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা করেন, এ নীতিই ছিল আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযি. এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযি. এর।

(৩) কোন হাদীসের সহীহ-যঈফ হওয়া নির্ধারণ করাও একটি ইজতিহাদি বিষয়, এ কারণেই জারহ ওয়া তা'দীল তথা হাদীসের সনদ নিরীক্ষণ শাস্ত্রের সম্মানিত ইমামগণের মাঝেও একই হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা যায়, একজন ইমাম সহীহ বা হাসান বলেন, অন্যজন বলেন যঈফ, হাদীসশাস্ত্রের সাথে সামান্য সম্পর্ক আছে, তারা এ কথা ভালো করেই জানেন।

এ ভিত্তিতেই ইমাম আযম রহ. একটি হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করে গ্রহণ করেন, পক্ষান্তরে অন্য ইমামের দৃষ্টিতে তা যঈফ মনে হওয়ায় তিনি উক্ত হাদীস তরক করেন। তবে যেহেতু ইমাম আযম রহ নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন, তাই অন্য কোন মুজতাহিদের উক্তি তার বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না, এটাই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নীতি।

(৪) কখনো এমন হয় যে, কোন একটি হাদীস ইমাম আযম রহ. পর্যন্ত সহীহ সনদে পৌঁছেছে, এ জন্য তিনি তা গ্রহণ করেছেন এবং তদানুযায়ী আমল করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে কোন রাবীর দুর্বলতা হেতু হাদীসটির মাঝে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তাই পরবর্তী ইমামগণ সেটাকে গ্রহণ করেন নি। অতএব পরবর্তীকালের সৃষ্ট দুর্বলতার দায় কিভাবে ইমাম আযম রহ. এর উপর চাপানো যায়? আর এর উপর ভিত্তি করে তিনি যঈফ হাদীসের উপর আমল করেছেন; এ কথা বলা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

(৫) অনেক সময় একটি হাদীসের একাধিক সনদ থাকে, কোনটা সহীহ; কোনটা যঈফ, এ ক্ষেত্রে যিনি হাদীসটি যঈফ সনদে পেয়েছেন; তিনি হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, আর যিনি সহীহ সনদে পেয়েছেন তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যেমনঃ হাদীস শরীফে এসেছেঃ من كان له إمام فقرائة الإمام له قرائة. অর্থঃ ইমামের পিছনে নামায পড়েন, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত সাব্যস্ত হবে।

বিশেষ দু'একটি সনদের কারণে কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে ইবনে মানী ও কিতাবুল আছার ইত্যাদি গ্রন্থে সম্পূর্ণ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(৬) অনেক সময় একটি হাদীসের সবগুলি সনদই যঈফ হয়, কিন্তু একাধিক সনদের সমষ্টিগত বিচারে হাদীসটিকে গ্রহণ করা হয়, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয়, এ জাতীয় হাদীসের উপর যারা আমল করেন;

তাদেরকে যঈফ হাদীসের উপর আমলকারী বলা ইনসাফপূর্ণ আচরণ হবে না। যেমন-একটি হাদীস হল, كل قرض جر منفعة فهو ربا.
(অর্থঃ ঋণের বিনিময় যে লাভ অর্জিত হয় তাই সুদ) হাদীসটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলি সনদই যঈফ, তবে যেহেতু অধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে; তাই মুহাদ্দিস আযীযী রহ. 'আস-সিরাজুল মুনীর' এ হাসান লি গাইরিহি বলেছেন। আর হাসান লিগাইরিহী মানের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা স্বীকৃত ব্যাপার। সুতরাং হাদীসের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে লাভ অর্জন করা সূদ সাব্যস্ত হয়েছে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- খণ্ডঃ১পৃ. ৫৬৮)

আমাদের অনেক বন্ধুগণ মনে করেন যে, যঈফ হাদীস মওযু তথা জাল হাদীসের পর্যায়ে, তাই যঈফ হাদীসকেও জাল হাদীসের মত ছুড়ে ফেলেন, অথচ কোন মুহাদ্দিসই এমনটি করেন নি, কেননা মুহাদ্দিসগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যঈফ হাদীস ফাযায়েল ও মুস্তাহাব বিষয়ে শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য, আহকামাত তথা দ্বীনের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা বা দলীল দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমাদ রহ. এর মতে আহকামাতেও যঈফ হাদীসের উপর আমল করা যায়, এটা মুহাদ্দিসীনের এক অংশের কর্মপন্থাও। যথা আবূ দাঊদ, নাসাঈ, আবূ হাতেমের শর্ত হল দু'টিঃ

১. দুর্বলতাটি গুরুতর না হওয়া ২. মাসআলার ক্ষেত্রে এছাড়া অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যাওয়া। এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেনঃ যঈফ হাদীস আমাদের নিকট কিয়াস বা রায় থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। এমনকি ইমাম শাফিয়ী রহ, যিনি মুরসাল হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করেন; তিনিও যেখানে মুরসাল ছাড়া অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না, সেখানে মুরসাল হাদীস অনুযায়ীই আমল করেন। তা ছাড়া ইমাম শাফিয়ী রহ. তার কিতাবুল উম্ম এ অনেক মুরসাল হাদীস দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (আছারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ৩৬, ৩৭, ৩৮)

শায়খ আব্দুল্লাহ আস সিদ্দিক আল গুমারী রহ. বলেন, আহকামের মধ্যে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয় কথাটিকে অনেকেই বা সকলেই একটি স্বীকৃত নীতি মনে করেন, আসলে বিষয়টি এমন নয়। ...তিনি আরও বলেন, আমাদের মাকতাবায় তাজুদ্দীন আত-তিবরীযী এর মি'য়ার নামক কিতাব আছে, সংকলনকারী কিতাবটিকে ফিকহী তারতীবে সাজিয়েছেন, প্রত্যেক অধ্যায়ে কিছু যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন; যেগুলো চারও মাযহাবের ইমামগণ সম্মিলিতভাবে বা এককভাবে গ্রহণ করেছেন। (আছারুল হাদীসিস শরীফ পৃ. ৩৮)

শুধু তাই নয়, কখনো যদি কোন যঈফ হাদীসের উপর সকল সাহাবা ও তাবেঈন যুগ যুগ ধরে আমল করে থাকেন; তাহলে এ কথাই বুঝতে হবে যে, এই হাদীসটি মূলত সহীহ, যদিও তার সনদ যঈফ। আর এ নীতির ভিত্তিতেই لا وصية لوارث (অর্থঃ ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়।) এ হাদীসটিকে সকল মুজতাহিদ গ্রহণ করেছেন।

এমনকি এ উসূলের ভিত্তিতে কোন কোন ক্ষেত্রে যঈফ বর্ণনাকে সহীহ বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও কখনো প্রাসঙ্গিক দলীলের ভিত্তিতে যঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দেন এবং তার উপর আমল করেন, যেমন অন্যান্য ইমামগণও করেছেন, সুতরাং এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার কোন সুযোগ নেই।

(৮) অনেক সময় দেখা যায়, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাবকে সহীহভাবে জানারই চেষ্টা করা হয় না, অজ্ঞতাবশতঃ তার মাযহাবকে হাদীস পরিপন্থী ধরে নেওয়া হয় এবং অনৈতিকভাবে তাঁকে দোষারোপ করা হয়, যেমনঃ কোন কোন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসও এ জাতীয় ভুলের শিকার হয়েছেন, অথচ একথা বলার অপেক্ষ রাখে না যে, হানাফী মাযহাব সম্পূর্ন কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশুদ্ধ ও সংগঠিত শক্তিশালী মাযহাব। তথাপি উপরোক্ত অযাচিত ভুলের শিকার আহলে হাদীসের অধিকাংশ তথাকথিত আলেমগণও।

উদাহরণত বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম হযরত মাওলানা ইসমাইল সালাফী রহ. কেই দেখুন, তিনি "তা'দীলে আরকান" এর মাসআলায় হানাফী মাযহাবের সমালোচনা করে লিখেনঃ হাদীস শরীফে আছে, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নামায পড়ল, কিন্তু রুকু-সেজদা ধীর-স্থীরতার সাথে আদায় করল না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,"صل فإنك لم تصل" নামায পড়ে নাও, কারণ তুমি নামায পড় নি, (অর্থাৎ, শরী'আতের দৃষ্টিতে তোমার নামায অস্তিত্বহীন) এরূপ ক্রমান্বয়ে তিনবার হল। এই হাদীসের ভিত্তিতে আহলে হাদীস, শাফিয়ী, ও অন্য কিছু ইমাম মনে করেন, রুকু-সেজদা ধীরস্থীরভাবে আদায় না করলে নামায আদায় হবে না। আর হানাফীগণ বলেন, রুকু-সেজদার অর্থ জানার পর আমরা হাদীসের ব্যাখ্যা আর নামায না হওয়ার সিদ্ধান্ত মানি না(?) (অর্থাৎ, নূন্যতম রুকু-সেজদা করলেই নামায হয়ে যাবে)'।

অথচ এটা হানাফী মাযহাব সম্পর্কে একটি ঘৃণ্য মিথ্যাচার।

বাস্তব কথা হল, হানাফিগণও "صل فإنك لم تصل" এই হাদীসের ভিত্তিতেই বলেন, যদি রুকু-সেজদা পূর্ণ ধীর-স্থীরতার সাথে আদায় না করে, তাহলে ওয়াজিব তরক করার দরূন পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব। অতএব হানাফীগণ

উপরোক্ত হাদীসের পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নকারী এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, তবে ইমাম আযম রহ. 'ফরজ' ও 'ওয়াজিব' এর মাঝে পার্থক্য করেন, ধীর-স্থিরতাকে ওয়াজিব বলেন, আর অন্য ইমামগণ এই পার্থক্য মানেন না, তাই তারা ধীর-স্থীরতাকে ফরয বলেন।

ইমাম আযম রহ. বলেন, কুরআনে কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয় হল ফরজ। আর 'খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় হল ওয়াজিব। আমলগতভাবে এ দুয়ের মাঝে তেমন কোন ফরাক নেই, ফরয ছেড়ে দিলেও নামায পুনরায় আদায় করতে হয়, ওয়াজিব ছেড়ে দিলেও নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। এ দুইয়ের মাঝে শুধুমাত্র ব্যাখ্যাগত পার্থক্য রয়েছে, ফরয ছেড়ে দিলে তাকে সরাসরি নামায পরিত্যাগকারী বলা হবে, পক্ষান্তরে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে বলা হবে ওয়াজিব পরিত্যাগকারী , অর্থাৎ তার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে।

একটু ঘুরিয়ে এটাকে এভাবেও বলা যায়, ওয়াজিব ত্যাগ করলে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, আর ফরয ত্যাগ করলে নামায পুনরায় আদায় করা ফরয।

আর এটা উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী কিছু নয়, স্বয়ং এই হাদীসের শেষাংশেই এর পক্ষে সমর্থন রয়েছে, অর্থাৎ,ধীরস্থিরতা বর্জনকারীর নামাযকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল বলেন নি, বরং ত্রূটিপূর্ণ বলেছেন, এ কথাটি ইমাম আযম রহ. এর পক্ষে একটি শক্তিশালী দলীল, যেমন তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ সাহাবীকে বললেন "صل فإنك لم تصل" অর্থাৎ, নামায পড়ে নাও, কারণ তুমি নামায পড় নি, তখন বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কাছে খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল যে, একজন লোক একটু দ্রুত নামায পড়ল, তাই তাকে বলা হচ্ছে, "তুমি নামায পড়নি" এর কিছুক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির অনুরোধে নামাযের সহীহ তরীকা শিক্ষা দিতে গিয়ে ধীর-স্থিরভাবে নামায পড়ার তাগীদ করলেন এবং বললেন,

فإذا فعلت تمت صلوتك وإذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك. (رواه الترمذى :৩০২)

'এই কাজটুকু যখন তুমি করবে, তোমার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এতে কোনরূপ ত্রূটি করলে তোমার নামায ত্রূটিপূর্ণ রয়ে যাবে'। এখানে তার নামায বাতিল হওয়ার কথা বলেন নি, ধীর-স্থিরতা ফরয হলে তার নামায ত্রূটিপূর্ণ নয়, বরং বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত রিফায়াহ রাযি. বলেন,

وكأنه هذا أهون عليهم من الأولى أنه انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته و لم تذهب كلها.

অর্থাৎ, এটি সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রথম কথার তুলনায় সহজতর মনে হয়েছে। কেননা এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন ত্রূটি হলে নামাযতো ত্রূটিপূর্ণ হবে, তবে পূর্ণ নামায বাতিল হবে না। (তিরমিযী শরীফ হা, নং, ৩০২,২৬৯৬)

হাদীসের এই অংশটি হানাফীদের আমলকে সুস্পষ্টরূপে পরিপূর্ন সমর্থন করছে, তারা হাদীসের প্রথম অংশের ভিত্তিতে বলেন, “তা’দীলে আরকান” তথা “ধীর-স্থিরতা”র সাথে নামায না পড়লে তা পুনরায় আদায় করতে হবে, আর শেষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, যদি “তা’দীলে আরকান” ব্যতীত নামায পড়ে, সেক্ষেত্রে তাকে নামায বর্জনকারী বলা যাবে না। আচ্ছা এই ব্যাখ্যার পর একটু চিন্তা করে বলুন, ‘হানাফীগণ হাদীসের ব্যাখ্যা মানে না’ এ ধরণের মন্তব্য কি ঠিক? এটা কি হানাফী মাযহাবের অপব্যাখ্যা ও এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার নয়?

সারকথা হল, অনেক সময় হানাফী মাযহাবের প্রকৃত অবস্থান না জেনে না বুঝেই অনেকেই পাইকারীভাবেই বলে দেন যে, এটা হাদীস বিরোধী মাযহাব।

উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে যদি কেউ হানাফী মাযহাবের পর্যালোচনা করেন, দলীল-প্রমাণের আলোকে নিরীক্ষণ করেন, তাহলে তার সামনে দিবালোকের ন্যায় এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, হানাফী মাযহাব যঈফ হাদীস নির্ভর হওয়া তো দূরের কথা, বরং এটি সুদৃঢ় দলীলভিত্তিক একটি মাযহাব, যা কুরআন-সুন্নাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী। এই মাযহাবে সতর্কতা ও খোদাভিরুতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে।

শা‘রানী রহ. ইমাম শাফিয়ী রহ.ও ইমাম আযম এর সমালোচনাকারীদের জবাব লিখেন, তিনি বলেন, হে অভিযোগকারীগণ, তোমরা তারাহুড়া কর না, কারণ, ইমাম আযমের অনেকগুলি মুসনাদ থেকে আমার তিনখানা মুসনাদ পড়ার তৌফীক হয়েছে, যার দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি যে, তাদের অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন, উপরন্তু তার মাযহাবকে আমি সকল মাযহাবের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর অত্যাধিক নিকটবর্তী পেয়েছি। (মীযানুল কুবরা,১/৮২-৮৫)

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে বাস্তবতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

দালীলিক প্রমাণপঞ্জির আয়নায় আহলে হাদীস মতবাদ

১৬ই জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এক ঐতিহাসিক বয়ান পেশ করেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে বয়ানটি আপনাদের খেদমতে পেশ করা হল।

ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করার পর যখন বুঝতে পারল জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন এবং খুন-গুম করে এদেশের মুসলমানদেরকে দমন করা সম্ভব নয়। সত্যিকার মুসলিম জনতা চির স্বাধীন, অন্যায় ও অসত্যের কাছে তারা কখনো মাথা নত করে না, তখন তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, বাগে আনতে হলে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে দিতে হবে। ইংরেজ সরকার তাদের এ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের অনুগত চারজন লোকের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে চার ধরনের ফিৎনা ছড়িয়ে দিল। এগুলোর অন্যতম ছিল, আহলে হাদীস ফিৎনা। মৌলভী আব্দুল হক বেনারসীর (মৃত্যু:১২৭৫ হি.) উদ্ভাবিত মৃতপ্রায় এই মতবাদকে পুনঃজীবিত করার লক্ষ্যে ইংরেজ সরকার মুহাম্মাদ হুসাইন আহমদ বাটালবীকে বেছে নেয়। বাটালবী সাহেব সরলমনা মুসলমানদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে হাদীস মানার চটকদার বুলি আওড়ে এক ভয়াবহ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসারী মাযহাব মেনে চলা মুসলমানদেরকে তিনি কাফের-মুশরিক বলে ফতোয়া দেন। ‘ইংরেজ শাসন আল্লাহর রহমত, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম’- এ ধরনের মারাত্মক বিষও তার কলম উগরে দেয়।

▪ শুরুর দিকে এ দলটি নিজেদেরকে মুহাম্মাদী, সালাফী, লা-মাযহাবী, ওয়াহাবী, আছারী ইত্যাদি বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এসব পরিচয়ে তারা তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। তাই বাটালবী সাহেব ইংরেজ সরকার বরাবর দরখাস্ত করলেন “আমার সম্পাদিত এশায়াতুস সুন্নাহ পত্রিকায় ১৮৮৬ইং সনে প্রকাশ করেছিলাম যে, ওয়াহাবী শব্দটি ইংরেজ সরকারের নিমকহারাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এ শব্দটি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ঐ অংশের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন হবে না যাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয় এবং যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নিমকহালালী, আনুগত্য ও কল্যাণই কামনা করে যা বারবার প্রমাণিতও হয়েছে এবং সরকারী চিঠি-পত্রেও এর স্বীকৃতি আছে। অতএব এ দলের প্রতি ওয়াহাবী শব্দ ব্যবহারের জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট বরাবর অত্যন্ত আদব ও সবিনয় নিবেদন করা যাচ্ছে যে, সরকারীভাবে এই ওয়াহাবী শব্দ রহিত করে আমাদের উপর তা প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক। -আপনার অনুগত আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন, সম্পাদক এশায়াতুস সুন্নাহ”।

অনুগত বান্দার এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর দফতর থেকে “তার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হল এবং তাদের জন্য আহলে হাদীস নাম সরকারীভাবে বরাদ্দ করা গেল”-মর্মে চিঠি পাঠানো হয়। সরকারের তরফ থেকে পাঠানো সেসব চিঠির তালিকা লক্ষ্য করুন- পাঞ্জাব গভর্নর সেক্রেটারি মি. ডব্লিউ এম এন- চিঠি নং ১৭৫৮, সি পি গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ৪০৭, ইউ পি গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ৩৮৬, বোম্বাই গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ৭৩২, মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট- চিঠি নং

১২৭, বাঙ্গাল গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ১৫৫ (সূত্র: এশায়াতুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৯, সংখ্যা ২, খণ্ড ১১)।

আহলে হাদীস খেতাব বরাদ্দ পেয়ে বাটালবী সাহেব দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে হাদীস মানার নামে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করেন। এ কাজে তিনি নিজের সবটুকু শ্রম-সাধনা ইংরেজের সন্তুষ্টি অর্জনে বিলিয়ে দেন। তারপর কুদরতের কারিশমা দেখুন, পঁচিশ বছর পর সেই এশায়াতুস সুন্নাহ পত্রিকায় সেই মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী লিখলেন 'যে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যেতে চায় তার জন্য সহজ পথ হল, তাকলীদ ছেড়ে দেয়া।' (সূত্র: এশায়াতুস সুন্নাহ, খণ্ড ১১, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ৫৩)। এ যেন নিজের হাঁড়ি নিজেই হাটে ভাঙ্গার নামান্তর।

বাটালবী সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইংরেজের সেবা করে গেছেন। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মরে গেছেন কিন্তু তার বই-পুস্তক আর ভ্রান্ত মতবাদ আজও রয়ে গেছে। সেগুলোর মাধ্যমে এখনো হাজার হাজার মুসলমান গোমরাহ হচ্ছে।

আমাদের দেওবন্দী আকাবিরদের প্রতিরোধের মুখে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আহলে হাদীস ফিৎনার দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমাদের অলসতার সুযোগে তারা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এতদিন তারা গর্তে লুকিয়ে ছিল, এখন বের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। মাযহাব মানার স্বরূপ না বুঝে কিংবা জেনে বুঝেই হঠকারিতা বশতঃ তারা বলে, আমরা নাকি ইমাম আবূ হানীফা রহ.কে নবী মেনে কাফির হয়ে গেছি। আশ্চর্য! আমরা কিভাবে আবূ হানীফাকে নবী মানলাম? নবীর তো প্রতিটি আদেশ-নিষেধই উম্মতকে মেনে চলতে হয়। অথচ আমরা তো বহু মাসআলায় আবূ হানীফা রহ. এর তাকলীদই করি না। কারণ সেগুলো এতটাই স্পষ্ট যে, কোনরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। অনুরূপ হাজারও মাসআলায় হানাফী মুফতীগণ সাহেবাইনের মতানুযায়ী ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। তাহলে কিভাবে আমরা ইমাম আবূ হানীফাকে নবী মানলাম? তাছাড়া সব বিষয়েই কি ইমামের তাকলীদ করা হয়? তাকলীদ তো করা হয় এমন কিছু জটিল বিষয়ে যার সমাধান কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। অনুরূপ একই বিষয় যখন বাহ্যতঃ সাংঘর্ষিক একাধিক বিধান পাওয়া যায় তখন কোনটা নাসেখ আর কোনটা মানসূখ তা আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না। তাই এ জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা খাইরুল কুরূনের মুজতাহিদ ইমামদের বুঝ ও উপলব্ধিকে আমাদের বুঝ ও উপলব্ধির চেয়ে শতগুণ উত্তম মনে করে তাদের বুঝ-উপলব্ধির অনুসরণ করি। আমরা কখনই তাদের ব্যক্তি সত্তার পূজা করি না। এটাই তাকলীদের মূল কথা। কিন্তু যেসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ রয়েছে যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমাযান মাসে রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, হজ্ব করা এ জাতীয় শত শত বিষয়ে আমরা

কোন ইমামের ব্যাখ্যার অপেক্ষা করি না। অর্থাৎ তাদের তাকলীদের প্রয়োজন অনুভব করি না। কারণ এসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমরাই স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তাহলে বলুন, এভাবে তাকলীদ করার কারণে আমরা কিভাবে কাফির-মুশরিক হয়ে গেলাম?

আহলে হাদীস নামক এই ভ্রান্ত মতবাদকে নতুন করে চাঙ্গা করেছেন মরহুম নাসিরুদ্দীন আলবানী। তার বাড়ী সিরিয়ার আলবেনিয়া নামক স্থানে। তার পিতা নূহ নাজাতী রহ. হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। ছেলের বিতর্কিত আচরণে অধৈর্য হয়ে ছেলেকে তিনি ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। সিরিয়ার জনগণ মরহুম আলবানীকে বিতর্কিত মতবাদের কারণে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তারপর তিনি সৌদিআরবে আশ্রয় নেন। এক পর্যায়ে সৌদির আলেম উলামা ও জনসাধারণও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে সরকারী নির্দেশে ১৯৯১ সালে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি আরবভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি জর্ডানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ১৯৯৯ইং সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার কোন নিয়মতান্ত্রিক উস্তাদ ছিল না। ব্যক্তিগত গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে যা বুঝেছেন তাই লিখে গেছেন। এ ব্যাপারে তার বিশেষ অবদান(?) হল, তিনি হাদীসসমূহকে সহীহ, যঈফ দুই ভাগে বিভক্ত করে দু'টি কিতাব সংকলন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি যঈফ হাদীসের সংকলনের সাথে মউযূ' হাদীসকে মিলিয়ে উভয়টিকে একাকার করে ফেলেছেন এবং যঈফ, মউযূ'র সমন্বিত সংকলনের নাম দিয়েছেন

سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ فى الامة

এখন প্রশ্ন হল, যঈফ আর মউযূ' কি এক জিনিস, উভয়টির ক্ষেত্রে কি একই বিধান প্রযোজ্য হয়? মউযূ' তো হাদীসই নয়; এটাতো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা। অথচ যঈফ তো হাদীস। ضعف (যু'ফ) হল, সনদের সিফাত; হাদীসের সিফাত নয়। যেমন, সহীহ, হাসান এগুলো সনদের সিফাত; হাদীসের সিফাত নয়। এগুলো দ্বারা তো সনদের অবস্থা বুঝানো হয়। যঈফ হাদীস যদি একাধিক সনদে আসে তখন এর দ্বারা হুকুমও সাবেত হয়। অনুরূপ যঈফ হাদীস যদি উম্মত কবুল করে নেয় তাহলে তা সহীহ'র মতো হয়ে যায়। যেমন, لا وصية لوارث এই হাদীসের সনদ তো যঈফ কিন্তু উম্মত এটাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে বলে তা মা'মূলবিহী হয়েছে এবং এর দ্বারা হুকুমও সাবেত হয়েছে। অনুরূপ طلب العلم فريضة على كل مسلم

এই হাদীসটি পঞ্চাশটি সনদে এসেছে। (ইবনে মাজাহ, ২২৪ নং হাদীসের টীকা)। কিন্তু প্রত্যেকটি সনদই যঈফ। তথাপি এতগুলো সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী হয়ে গেছে। ফলে এর দ্বারা ফরযের মতো গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সাবেত করা হয়েছে। আর যঈফ হাদীস যদি হাসান লিগাইরিহী পর্যন্ত না-ও

পৌঁছে তবুও তা মউযূ'র মতো বেকার নয়। বরং কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফযীলতের ক্ষেত্রে তা আমলযোগ্য। তাহলে বলুন, হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞানও রয়েছে তার পক্ষে যঈফ আর মউযূ'কে এক মনে করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? বর্তমানে আরব বিশ্বে আলবানী সাহেবের বিরুদ্ধে বহু কিতাব লেখা হচ্ছে। তার মধ্যে তানাকুযাতে আলবানী নামক কিতাবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক এই কিতাবে আলবানী সাহেবের স্ববিরোধী কথা ও কাজগুলো দায়িত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি সেখানে দেখিয়েছেন, আলবানী সাহেব কোনো একটি হাদীস তার মতের পক্ষে হওয়ায় সেটাকে সহীহ বলেছেন। আবার ঐ একই সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যখন তার বিরোধী পক্ষ দলীল দিয়েছেন তখন সেটাকে নির্দ্বিধায় যঈফ বলে দিয়েছেন। এ জাতীয় বহু ঘটনা ঐ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

▪ 'আহলুল হাদীস' মূলতঃ হাদীস বিশারদ ও শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ ইমামদের উপাধি। ১২৪৬ হিজরীর পূর্বে ফেরকা ও সম্প্রদায়ের আদলে পৃথিবীতে আহলে হাদীস নামে কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানের আহলে হাদীস ফেরকা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে এ কথার দাবী করে যে, তারা সর্ব ক্ষেত্রে হাদীস মেনে চলে। অথচ হাদীসের কিতাবে দেখা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কোথাও হাদীস মানতে বলেননি; বরং তিনি যেখানেই তাঁকে মানতে ও অনুসরণ করতে বলেছেন সেখানে সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি উম্মতকে সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন, সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন; হাদীস অনুসরণ করতে কিংবা আঁকড়ে ধরতে বলেননি। বরং তিনি গোমরাহ ফেরকার কার্যক্রম বুঝাতে গিয়ে হাদীস শব্দ ব্যবহার করেছেন। সহীহ মুসলিমের সাত নং হাদীস এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বলেন, শেষ যামানায় অনেক প্রতারক ও মিথ্যুক লোকের আবির্ভাব হবে। তারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস পেশ করবে যা তোমরাও শোননি, তোমাদের পূর্বপুরুষগণও শোনেনি। সাবধান! তারা যেন তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।

▪ বস্তুতঃ হাদীস ও সুন্নাহ এক জিনিস নয়, এ দু'য়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আমাদের আকাবিরগণ তাদের বিভিন্ন কিতাবে হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা হল, উম্মতের জন্য দ্বীনের উপর চলার অনুসরণীয় পথকে সুন্নাহ বলে। আর প্রত্যেক সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ সকল হাদীসই উম্মতের জন্য দ্বীনের উপর চলার অনুসরণীয় পথ নয়। কেননা হাদীসের মধ্যে বহু হাদীস এমন আছে যেগুলোর বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। উদাহরণতঃ

▪ বুখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েযের ১৩০৭ থেকে ১৩১৩ নং হাদীসসমূহ। এসব হাদীসে জানাযা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলে সকলকে দাঁড়িয়ে যেতে বলা

www.muslimdm.com

হয়েছে। অথচ এই বিধান অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (উমদাতুল ক্বারী ৬/১৪৬)

- ইসলামের প্রথম যুগে নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া সবই বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ১১৯৯, ১২০০)

- ইসলামের প্রথম যুগে বিধান ছিল যে, আগুনে রান্নাকৃত খাদ্য গ্রহণ করলে উযু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৮)

- নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ৭২৫২) এগুলোর সবই সহীহ হাদীস কিন্তু সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়।

- এমন অনেক হাদীস আছে যার বিধান নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নির্দিষ্ট। উম্মতের জন্য তার উপর আমল করা বৈধ নয়। যেমন, বহু হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এগারটি বিবাহের কথা এবং মহর দেওয়া ছাড়া বিবাহ করার কথা এসেছে। তো এগুলো হাদীস বটে কিন্তু উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১১/১৪৩-২১৭)

- হাদীসে এমন অনেক আমলের কথা বর্ণিত আছে যা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন বিশেষ প্রয়োজনে করেছেন। যেমন, কোমরে ব্যথা থাকার কারণে কিংবা এস্তেঞ্জা করার স্থানে বসার দ্বারা শরীরে বা কাপড়ে নাপাকী লাগার আশঙ্কায় তিনি সারা জীবনে মাত্র দুই বার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কিন্তু হাদীসের বর্ণনায় এসব কারণের কথা উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা আলোচিত হয়েছে। তো এই হাদীসের উপর আমল করে কি দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে সুন্নাত বলা যাবে? অনুরূপভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯৩৮)। তাই বলে কি ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানোকে সুন্নাত বলা যাবে?

- কাজটি বৈধ একথা বুঝানোর জন্যও নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কাজ করেছেন। যেমন, তিনি একবার তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যয়নবকে কোলে নিয়ে নামায পড়িয়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫১৬)। আরেকবার রোযা অবস্থায় তাঁর এক স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯২৮)। এই উভয় ঘটনাই হাদীসে এসেছে। এর দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশু কোলে নিয়ে নামায পড়া বা পড়ানো যেতে পারে এবং রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ, এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে

www.muslimdm.com

না। তাই বলে কি সব সময় শিশু কোলে নিয়ে নামায পড়ানোকে কিংবা রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বনকে সুন্নাত বলা যাবে?

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হল, আহলে হাদীস নামটিই সঠিক নয়। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বর্ণনায় উম্মতকে হাদীস মানতে বলেননি, বলেছেন সুন্নাত মানতে। তারপরও যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবী করে তাদের উচিৎ এগারটি বিবাহ করা, মহর ছাড়া বিবাহ করা, ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করা, দাঁড়িয়ে পেশাব করা ইত্যাদিকে সুন্নাত মনে করে আমল করা। অনুরূপ জীবনে মাত্র তিন দিন মসজিদে এসে তারাবীহ পড়া, নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া। কারণ এগুলোও তো হাদীসে এসেছে। কিন্তু তারা তো এসব করে না। তাহলে হাদীস মানার দাবীদার হয়ে এসব হাদীসের উপর আমল না করে কিভাবে তারা আহলে হাদীস হল? আসল কথা হল, তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বললেও বাস্তবে তা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন তাই আমরা মাযহাব অনুসারীগণ হাদীসের শুধুমাত্র সুন্নাহ অংশের অনুসরণ করি এবং নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ বলে পরিচয় দিই। অর্থাৎ আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মানি এবং সাহাবায়ে কেরামের জামা‘আতকে অনুসরণ করি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে ও মানতে বলেছেন। এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস লক্ষ্য করুন,

১. المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر شهيد. المعجم الأوسط لأبى القاسم الطبراني (৫/৩১৫)

২. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. الموطأ بروايتين(৫/৮৯৯)

৩. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها. سنن الترمذى لمحمد الترمذى(৫/৪৫)

৪. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سنن الترمذى لمحمد الترمذى(৫/৪৬)

৫. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. سنن الترمذى لمحمد الترمذى(৪/৬৬৯)

৬. ستة لعنتهم ولعنهم الله ...... والتارك لسنتي. سنن الترمذى لمحمد الترمذى (৪/৪৫৭)

৭. تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. مسند أحمد بن حنبل(৪/১০৫)

৮. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. صحيح مسلم(১/৬৯)

৯. عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنن أبي داود(৪/৩১৬)

১০. فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنن ابن ماجة للقزويني(১/১৫)

এখানে মাত্র দশটি হাদীস উল্লেখ করা হল। এসব হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন এবং সুন্নাহ তরককারীর উপর লা’নত করেছেন। একটি বর্ণনায়ও তিনি শুধু হাদীসকে (যা সুন্নাহর পর্যায়ে পৌঁছেনি) আঁকড়ে ধরতে বলেননি। আহলে হাদীস ভাইয়েরা গ্রহণযোগ্য এমন একটি হাদীসও পেশ করতে পারবেন কি যার মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেছেন কিংবা হাদীস অনুযায়ী উম্মতকে চলতে বলেছেন? হ্যাঁ, তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করতে বলেছেন, অন্যের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন। কিন্তু হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেননি বা হাদীস অনুযায়ী আমল করতে বলেননি। আমল করার জন্য তো হাদীসকে সুন্নাহ পর্যায়ে পৌঁছতে হয়।

আহলে হাদীস ফেরকা তাকলীদকে শিরক বলে। অথচ তারা তাদের দাবী প্রমাণে বুখারী মুসলিম এ ধরনের যেসব হাদীসের কিতাব থেকে দলীল দেয় সেসব কিতাবের কোথাও তাকলীদকে শিরক বলা হয়নি; বরং এগুলোর লেখক সবাই কোন না কোন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করতেন। যেমন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, ১/৪২৫-৪২৬)। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (মা‘আরিফুস সুনান, ১/৮২-৮৩)। প্রশ্ন হল, তাকলীদ করার কারণে কেউ যদি মুশরিক হয়ে যায় তাহলে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুতুবে সিত্তার ছয় জন লেখকই মুশরিক সাব্যস্ত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁদের কিতাব দিয়ে দলীল দেয় কেন? মুশরিকদের(?) লেখা কিতাব দিয়ে শরঈ বিষয়ে দলীল দেয়া জায়েয হবে কি?

আহলে হাদীস ভাইয়েরা হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, যঈফ ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোও তারা তাকলীদকারীদের কিতাব থেকেই

শিখেছেন। কারণ উসূলে হাদীসের পুরনো সব কিতাব তাকলীদকারী আলেমগণেরই লেখা। এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লক্ষ্য করুন, ১.নুখবাতুল ফিকার (ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী) ২.মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ (ইবনুস সালাহ শাফেয়ী) ৩.মুকাদ্দামাতুশ শাইখ (আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী হানাফী) ৪.আত্ তাসবিয়াতু বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা (ইমাম ত্বহাবী হানাফী) ৫.তাওজীহুন নযর (তাহের ইবনে সালাহ জাযায়েরী হানাফী) ৬.তাওযীহুল আফকার (আমীরে সান‘আনী হানাফী) ৭.শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার (মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী) ৮. ক্বাফুল আসার ফী সাফিফ উলূমিল আসার (রযীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হানাফী) ৯. ইম্‘আনুন নযর (শাইখ আকরাম সিন্ধী হানাফী) ১০. আর রাফ্‌উ ওয়াত তাকমীল (আব্দুল হাই লাখনুবী হানাফী) ১১.আল ইল্যা (কাযী ইয়ায মালেকী) ১২.আত্ তাক্বয়ীদ ওয়াল ঈযাহ (ইবনে রজব হাম্বলী)। অনুরূপ উসূলে হাদীসের উপর যত কিতাব আছে সবই কোন না কোন মুকাল্লিদ ও মাযহাবের অনুসারী লিখেছেন। প্রশ্ন হল, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এসব মুশরিকদের(?) কিতাব থেকে নেয়া হাদীস শাস্ত্রের এ সকল পরিভাষা তাদের জন্য ব্যবহার করা কিভাবে বৈধ হবে?

মাযহাব অস্বীকারকারী তথাকথিত আহলে হাদীসদের কোন ধারাবাহিক সিলসিলা নেই। তাদের জন্মই হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের গর্ভে। ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ দখল করার আগে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। থাকলে তারা ১২৪৬ হিজরীর পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায় কর্তৃক লেখা হাদীস, উসূলে হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ সম্পর্কীয় কোন কিতাব পেশ করুক। তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ, সম্ভব হলে তারা উপরোক্ত ছয় বিষয়ে তাদের লিখিত অন্ততঃ ছয়টি কিতাব দেখাক। তবে অবশ্যই সেটা ১২৪৬ হিজরীর পূর্বের লেখা হতে হবে। বস্তুতঃ তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে লিখিত যেসব কিতাব পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান তার সবই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী কিংবা মুজতাহিদের লেখা। কি আশ্চর্য বৈপরীত্য! মাযহাব অনুসারীদের কিতাব পড়ে পড়ে গলাবাজী করবে আবার তাদেরকে কাফির-মুশরিকও বলবে!

এ প্রসঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী, মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ. বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, হযরত মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. বলেছেন, আমার একজন আহলে হাদীস উস্তাদ ছিলেন। তিনি ফাতাওয়াও লিখতেন। একদিন তার কামরায় প্রবেশ করে দেখি, তিনি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব হিদায়া ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিয়া অধ্যয়ন করছেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকে বললাম, জনাব! আপনি আহলে হাদীস হয়েও হানাফীদের কিতাব অধ্যয়ন করছেন? তিনি বললেন, এসব কিতাব ছাড়া জুযইয়্যাত (শাখাগত বিভিন্ন মাসআলার সমাধান) আর কোথায় পাব? ফাতাওয়া তো এসব কিতাব দেখেই দেই কিন্তু দলীলের আলোচনায় এগুলোর নাম উল্লেখ করি না। বরং হিদায়ার

মাসআলার দলীল হিসেবে হিদায়ার মতন ও টীকায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করে লিখে দেই এই মাসআলাটি উক্ত হাদীস থেকে সাবেত হয়েছে। (মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত, ২/৯১)। বুঝুন অবস্থা! মুকাল্লিদদের কিতাব ছাড়া একটি কদমও চলে না আবার গলাবাজীর ধারও কমে না।

আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদিও প্রচার করে যে, তারা কারো তাকলীদ করে না। কিন্তু বাস্তবে তারা মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাকলীদ করে থাকে। কারণ তারা কোন বিষয়ের দলীল হিসেবে বুখারী, মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য কিতাব থেকে দলীল পেশ করে থাকে। এর অর্থ হল, তারা এসব মুহাদ্দিসীনে কেরামকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করে। আর এটাই তো তাকলীদ। অথচ বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কেরাম নিজেরা ফাতাওয়া না দিয়ে ফাতাওয়ার জন্য জনসাধারণকে ফকীহদের কাছে যেতে বলতেন। এ ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী রহ. এর মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সুনানে তিরমিযীর কিতাবুল জানায়েযের এক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, هكذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحديث ‘ফকীহগণ এই হাদীসের ব্যাপারে এমনটিই বলেছেন আর তারা হাদীসের মর্ম সবচেয়ে ভাল জানেন’। (তিরমিযী, হা. নং ৯৯০)

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ফাতাওয়ার জন্য লোকদেরকে মুজতাহিদ ইমামদের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিতেন এ রকম দু’টি ঘটনা লক্ষ্য করুন-

এক, সুলাইমান ইবনে মেহরান আল আ’মাশ রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি ফাতাওয়া জানতে আসল। তিনি তাকে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ছিলেন সুলাইমান ইবনে মেহরানের হাদীসের ছাত্র। আবূ ইউসুফ রহ. প্রশ্নকারীকে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করলেন। ইমাম আ’মাশ রহ. আশ্চর্য হয়ে আবূ ইউসুফ রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই জবাব কিভাবে দিলে? তিনি বললেন, জনাব! গতকাল আপনি যে হাদীস পড়িয়েছেন তার মধ্যেই তো এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে। বিস্মিত ইমাম আ’মাশ মন্তব্য করলেন, انتم الاطباء ونحن الصيادلة আসলে তোমরা হলে ডাক্তার আর আমরা কেবল ওষুধ বিক্রেতা। অর্থাৎ ওষুধ বিক্রেতার কাছে ওষুধের ভাণ্ডার থাকে কিন্তু কোন ওষুধ কোন রোগের জন্য তা তার জানা থাকে না। ঠিক তেমনই যে মুহাদ্দিস মুজতাহিদ নন তার কাছে হাদীস তো প্রচুর থাকে কিন্তু হাদীস দ্বারা কোন্ মাসআলা প্রমাণিত হয় তা তার জানা থাকে না। (আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী লিস্ সায়মারী, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

দুই, সদরুদ্দীন রহ. মানাকেবে আবী হানীফা নামক কিতাবে লিখেছেন, একবার উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. এর নিকট এক ব্যক্তি ফাতাওয়া জানতে আসল। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন তার বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, যুহাইর

www.muslimdm.com

ইবনে হারব প্রমূখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, ‘ফাতাওয়ার জন্য এখানে এসেছো কেন? আহলে ইলমদের কাছে যাও।’ হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বিস্মিত হয়ে বললেন, হুযূর! আপনার নিকট উপস্থিত এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ কি আহলে ইলম নন?! তিনি বললেন, না, তোমরা আহলে ইলম নও, তোমরা তো হলে আহলুল হাদীস (অর্থাৎ হাদীস বিশারদ) আহলে ইলম হল, আবূ হানীফার শিষ্যগণ। (ইরশাদুল কারী, পৃষ্ঠা ৩২)

দেখা যাচ্ছে, বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ফাতাওয়ার জন্য জনসাধারণকে মুজতাহিদ ফকীহদের দারস্থ হতে বলছেন। এখন তথাকথিত আহলে হাদীসদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, তারা যেসব মুহাদ্দিস ইমামদের তাকলীদ করে থাকেন সেই মুহাদ্দিস ইমামগণ জনসাধারণকে যেসব ফকীহদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন তারা এদেরকে মানেন না কেন? এবং এ ক্ষেত্রে তারা তাদের মুহাদ্দিস ইমামদের অনুসরণ করেন না কেন? তাদের কাছে এই প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য জবাব আছে কি? উপরন্তু মুহাদ্দিস ইমামগণ মুজতাহিদ ফকীহদেরকে মান্যবর মনে করার কারণে মুহাদ্দিসগণকেও কি তারা মুশরিক বলার হিম্মত রাখেন?

- আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল মানে না। অথচ ইজমা কিয়াস শরী‘আতের দলীল হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইজমা দলীল হওয়া সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াত

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

দ্বারা প্রমাণিত। এই আয়াত দ্বারা মুফাসসির এবং উসূলবিদ উলামায়ে কেরাম ইজমাকে শরী‘আতের দলীল প্রমাণ করেছেন। আর সূরা হাশরের ২ নং আয়াত (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. الحشر:٢) দ্বারা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া হাদীসের কিতাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কিয়াসের তো বহু বহু প্রমাণ রয়েছে।

- আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল না মানায় তারা সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত اليوم اكملت لكم دينكم.
‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম’ অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা এমন হাজার হাজার মাসআলা আছে যার সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে ফকীহগণ ইজমা অথবা কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে থাকেন। যারা ইজমা ও কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল মানবে না তারা ঐসব মাসআলার সমাধান কিভাবে দিবে? এবং আল্লাহ তা‘আলার ঘোষণা ‘আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’ এর বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব হবে? কয়েকটি মাসআলা লক্ষ্য করুন, আমাদের জানা মতে এগুলোর সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। আহলে হাদীস

www.muslimdm.com

সম্প্রদায়কে এই মাসআলাগুলোর সমাধান কোন প্রকার কিয়াসের আশ্রয় নেয়া ছাড়া সরাসরি কুরআনের আয়াত কিংবা সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেয়ার অনুরোধ করা হল।

- ডেসটিনি ২০০০ লি. জায়েয হবে কি না?
- প্রাইজবন্ড কেনা জায়েয হবে কি না?
- প্রভিডেন্ড ফান্ড বা জি.পি ফান্ডের টাকা ও লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?
- বর্তমান শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?
- প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয হবে কি না?
- বীমা-ইন্স্যুরেন্স করা জায়েয হবে কি না?
- ট্রেড মার্ক বেচা-কেনা জায়েয হবে কি না?
- দেশি-বিদেশি কাগজের নোট পরস্পরে কম-বেশী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?
- অ্যাডভান্সের টাকা গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?
- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় করা বা দান করা জায়েয হবে কি না?
- বিমানে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?
- রোযা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেওয়া জায়েয কি না?

হাজার হাজার আধুনিক মাসাইলের মধ্য থেকে মাত্র ১২টি মাসআলা উল্লেখ করা হল। আহলে হাদীস সম্প্রদায় পারলে কোন প্রকার কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্ততঃ এই ১২টি মাসআলার সমাধান যেন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেন। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা এই মাসআলাগুলোর সমাধান না দিতে পারলে তারা 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই আয়াতের অস্বীকারকারী প্রমাণিত হবে।

তাদেরকে কোন ফিকহী মাসআলার কথা বললে তারা বলে, সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফূ' হাদীস দিয়ে দলীল দিলে তারা মানতে রাজি আছে অন্যথায় এসব মাসআলা-মাসাইল তারা মানবে না। তাদেরকে বলব, আপনারা সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফূ' হাদীস কাকে বলে অর্থাৎ হাদীসের এসব সংজ্ঞা কুরআনের আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন তাহলে আমরাও প্রত্যেক মাসআলা সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারব। সম্ভব হলে তারা কুরআন কিংবা হাদীস দ্বারা সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফূ' হাদীসের সংজ্ঞা প্রমাণ করে দেখাক। অন্ততঃ এতটুকুই প্রমাণ করুক যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সহীহ, সরীহ, মুত্তাসিল, মারফূ' হাদীসই মানতে বলেছেন। অন্যান্য হাদীস মানতে নিষেধ করেছেন।

কুরআন-হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে যারা ইমামের ব্যাখ্যা মানে না; বরং সর্বক্ষেত্রে সরাসরি হাদীস মানার দাবী করে থাকে তাদের কাছে সবিনয় আরয, আপনাদের মতানুযায়ী তো মুক্তাদীর ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায হবে না। অর্থাৎ মুক্তাদীকে ইমামের পিছনেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এখন প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখে যে, ইমাম সাহেব কিরা'আত শেষ করে রুকুতে চলে গেছেন, তখন তার করণীয় কী হবে? অর্থাৎ তার ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? যদি বলেন, সে রুকুতে শরীক হয়ে রুকুতেই ফাতিহা পড়ে নিবে তাহলে সেটা হাদীসের খিলাফ হবে। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু সিজদার মধ্যে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। আর ফাতিহা কুরআনের অংশ হওয়াটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং রুকুতে ফাতিহা পড়া যাবে না। (তিরমিযী, হা. নং ২৬৪)। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীসকে হাসানুন সহীহুন বলেছেন। যদি বলেন যে, সে ব্যক্তি এ রাকাআতে শরীক হবে না; বরং দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে তারপর পরবর্তী রাকাআত থেকে ইমামের ইকতিদা করবে। তাহলে এটাও হাদীসের লঙ্ঘন হবে। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় তার ইকতিদা করতে বলেছেন। (তিরমিযী, হা. নং ৫৯১)। আলবানী সাহেবও এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হা. নং ১১৮৮)। কাজেই নিছক দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। আর যদি বলেন, সে ইমামের সাথে শরীক হবে কিন্তু এই রাকাআতটি গণনা করবে না তাহলে সেটাও হাদীসের খিলাফ হবে। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ পেলে রাকাআত গণনা করতে বলেছেন। (আবূ দাঊদ, হা. নং ৮৯৩। আলবানী সাহেবও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।) অতএব রুকূ পেলে রাকাআত গণনা না করার উপায় নেই। আর যদি শেষতক বলে বসেন, এ ব্যক্তি ফাতিহা না পড়ে ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই তার ইকতিদা করবে। তাহলে এটা স্বয়ং আপনাদের দাবীর খিলাফ হবে। কারণ আপনাদের দাবী ছিল, ফাতিহা পড়া ছাড়া মুক্তাদীর নামাযই হয় না। সুতরাং এই উত্তরেরও অবকাশ নেই। তো আখের যাবেনটা কোথায়?

■ অনুরূপ কোন ব্যক্তি যদি এমন সময় মসজিদে আসে যখন ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার শেষাংশ ولا الضالين পড়ছেন, তখন তার করণীয় কি হবে? আপনারা যেহেতু হাদীস মানেন তাই হাদীস অনুযায়ী উত্তর দেয়াই সমীচীন হবে। যদি বলা হয়, ইমামের সাথে সেও 'আমীন' বলবে। যেমন হাদীসে এসেছে, ইমাম যখন ولا الضالين বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল। (সহীহ বুখারী, হা. নং ৭৮২)। তাহলে বলব, তার জন্য তো ফাতিহা পড়া জরুরী। ফাতিহা না পড়লে তো তার নামাযই হবে না। কাজেই ফাতিহা না পড়ে কিভাবে সে 'আমীন' বলবে? আর যদি বলা

হয়, সে ইমামের ولا الضالين বলা সত্ত্বেও 'আমীন' বলবে না; বরং আগে ফাতিহা পড়বে তারপর একাকী 'আমীন' বলবে। তাহলে বলব, 'ইমাম যখন ولا الضالين বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল।' এই হাদীসের উপর কিভাবে আমল হবে?

আহলে হাদীস ভাইয়েরা কোন হাদীসের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে এই প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারলে আমরা খুশি হব। আর যদি এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান তাদের জানা না থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে ফিকহী মাসাইলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সেক্ষেত্রে তাদের কোন হাদীসেরই বিরোধিতা করতে হবে না। কেননা উল্লেখিত সকল হাদীস বিবেচনায় রেখে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হল, ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায না হওয়ার হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। অতএব মুক্তাদী এসে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই তার সাথে শরীক হয়ে যাবে। তার জন্য ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ হানাফী মুক্তাদীর জন্য আমীন বলতেও কোন ঝামেলা নেই। কেননা তার জন্যও ফাতিহা পড়ার বিধান নেই। কাজেই সে ইমামের ولا الضالين শোনে 'আমীন' বলতে পারবে। আর এতে তাকে কোন হাদীসের বিরোধিতাও করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম ও দায়েম থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

সমাপ্ত

www.muslimdm.com